‘মরিচঝাঁপি’
বামফ্রন্টের কলঙ্কজনক
অধ্যায় —পৃঃ ১৩

দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বড়ো বাধা
প্রাদেশিকতার রাজনীতি
— পৃঃ ১১

৭৩ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা।। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১।। ১৮ মাঘ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

ভ্যাকসিন নিয়েও রাজনীতি

রাজনীতির হাত থেকে রেহাই পেল না করোনা টিকাও। কেউ বলল বিজেপির ভ্যাকসিন, কেউ বলল নিরাপদ নয় এই টিকা, আবার কেউ দিল ধর্মের দোহাই। এ যেন টিকাকরণ অভিযানকে বিপর্যস্ত করার ইঁদুর দৌড়।

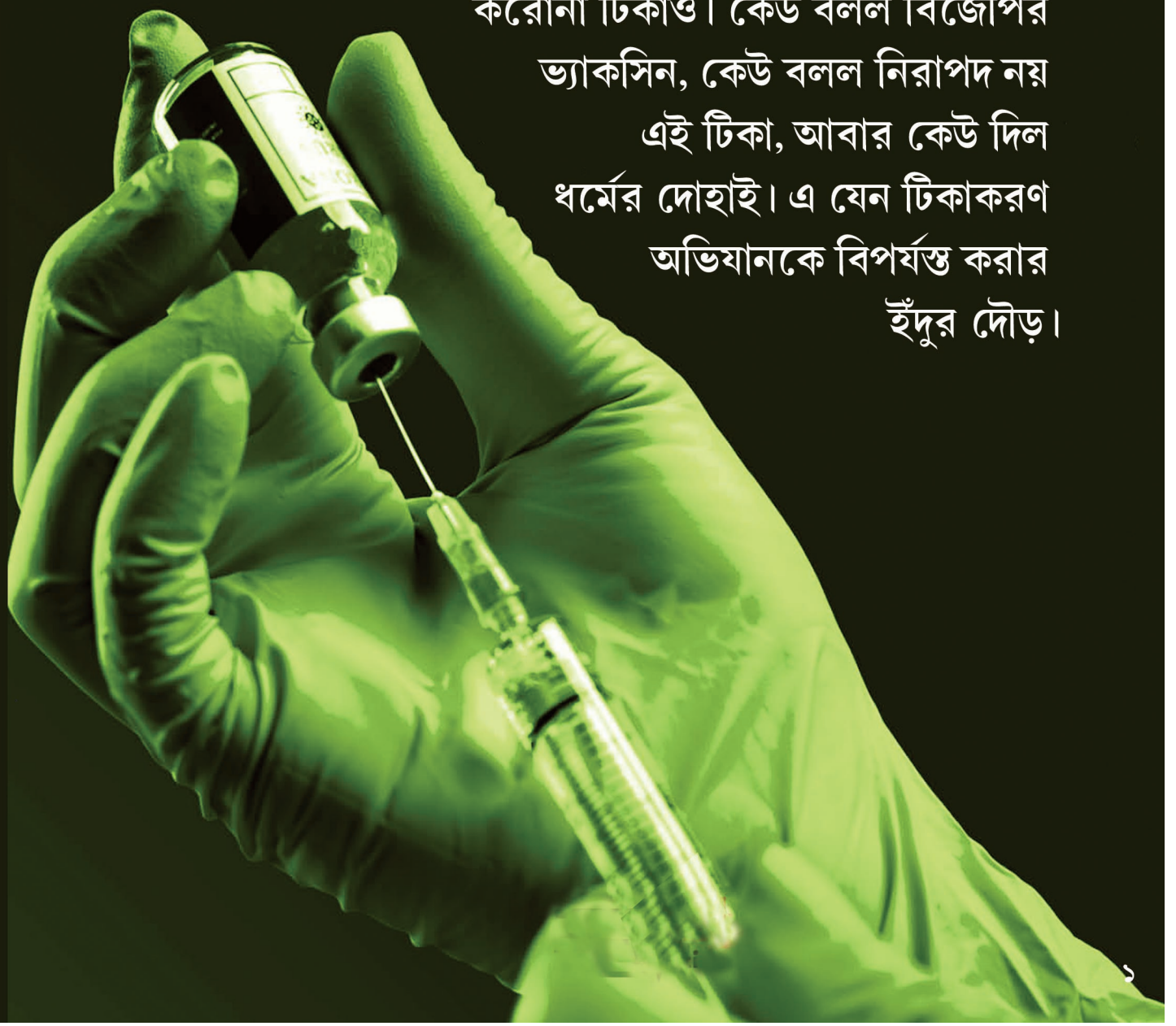

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ১৮ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১ ফেব্রুয়ারি - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

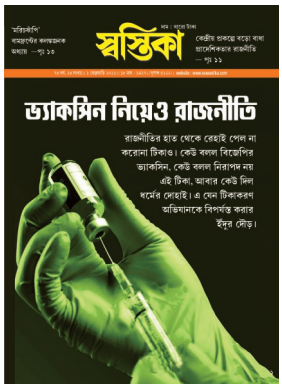

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

নেতাজী নিয়ে মৌরুসিপাট্টায় আঘাত পড়তেই শুরু চিলচিৎকার ▯ বিশ্বমিত্র **▯ ৬**

সুন্দর মৌলিকের চিঠি : 'জয় শ্রীরাম' বললে গ্রেফতার করা উচিত ▯ ৭

মন্দির নির্মাণে রাষ্ট্রপতির দান ধর্মনিরপেক্ষতার লঙ্ঘন নহে ▯ দেবযানী ভট্টাচার্য **▯ ৮**

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বড়ো বাধা প্রাদেশিকতার রাজনীতি ▯ শেখর সেনগুপ্ত **▯ ১১**

'মরিচঝাঁপি' বামফ্রন্টের কলঙ্কজনক অধ্যায় ▯ হীরক কর **▯ ১৩**

সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের পঞ্চাশ বছর : বামেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস পাপের ঘড়া পূর্ণ করল ▯ সুজিত রায় **▯ ১৭**

ভাইরাস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় টিকাকরণ ▯ স্বপন দাস **▯ ২৩**

ভারতীয় টিকায় কারো কোনো ক্ষতি হয়নি ▯ ডা. সমরজিৎ ঘটক **▯ ২৭**

সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে কাকোরি রেল ডাকাতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ▯ কৌশিক রায় **▯ ৩১**

ভারতের একটি প্রাচীন সাধনা বিপশ্যনা ▯ বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় **▯ ৩৩**

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশুদের হত্যা করেছিল জ্যোতিবাবুর পুলিশ ▯ গোপাল চক্রবর্তী **▯ ৩৫**

ভারতের সিরিজ জয় সম্মিলিত চেষ্টার ফসল ▯ অভিজিৎ ঘোষ **▯ ৪৩**

সত্যি কথা বলছেন বলে অর্ণব অনেকের চক্ষুশূল ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় **▯ ৪৪**

ক্ষমতায় থাকার জন্যই কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের তুষ্টিকরণের রাজনীতি ▯ ধীরেন দেবনাথ **▯ ৪৮**

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ খেলা : ২৮ ▯ সমাবেশ-সামাচার : ২৯-৩০ ▯ পত্রিকা পর্যালোচনা : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা : ৪২

প্রকাশিত হবে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে বিভাজনের রাজনীতির জন্য কারা দায়ী

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি নতুন শব্দের আমদানি হয়েছে— ধর্মীয় মেরুকরণ। শব্দটির অর্থ হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় বিভাজন। সিপিএম, কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের মধ্যে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটিয়ে একুশের নির্বাচনে ফয়দা তুলতে চায় বিজেপি। আসাদুদ্দিন ওয়েইসির দল মিম পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিজেপি-বিরোধী দলগুলির গলা আরও চড়েছে। কারণ, মিম ভোটে লড়লে মুসলমান ভোট ভাগাভাগি হবে এবং তাতে পরোক্ষভাবে সুবিধা হবে বিজেপির। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পশ্চিমবঙ্গে এই বিভাজনের রাজনীতির প্রকৃত স্রষ্টা কারা? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই নিয়ে চুলচেলা বিশ্লেষণ করবেন সুজিত রায়, আলি হোসেন প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

করোনা ভ্যাকসিন লইয়া রাজনীতি কাম্য নহে

করোনা মহামারী বিশ্বের কয়েকটি দেশকে যেভাবে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করিয়াছিল, ভারতের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। এই মারণ ভাইরাসকে রুখিতে ঠিক সময় আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যথাবিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে সুস্থ থাকিতে নানবিধ নিয়ম পালন করিবার আবেদন করিয়াছিলেন। খুবই আনন্দের বিষয় যে, দেশবাসী প্রধানমন্ত্রীর আবেদন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। বিশ্ববাসী অবাক হইয়া দেখিয়াছে ভারতবাসীর অনুশাসনপ্রিয়তা এবং সেই সঙ্গে সরকারের আন্তরিকতা। ইহারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'-এর ভারতে নিযুক্ত প্রতিনিধি হেঙ্ক বেকেডাম। জেনেভায় অনুষ্ঠিত মহামারী- সংক্রান্ত সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর মাইকেল রায়ান বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীর বুক হইতে পোলিয়ো ও গুটিবসন্ত নির্মূল করিবার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছিল ভারত। সুতরাং ভারতই পারিবে করোনা মোকাবিলায় বিশ্বকে পথ দেখাইতে।' করোনা মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকা লইয়া তৈরি 'কোভিড-১৯ ঃ ইন্ডিয়াস ওয়ার এগেনস্ট দ্য ভাইরাস' ডকুমেন্টারিতে বিল গেটস বলিয়াছিলেন, ' অতিমারীর মোকাবিলা করিবার ক্ষমতা ভারতের পক্ষে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল। এত বড়ো দেশ, এত বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে সংক্রমণ রোধ করা সহজ ব্যাপার নহে, কিন্তু সেই কাজ ভারত অত্যন্ত দক্ষতার সহিত করিয়া চলিতেছে।' প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ দিবা-রাত্র পরিশ্রম করিয়া করোনার প্রতিষেধক আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। টিকাকরণের কাজও শুরু হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, 'ভারত সম্পূর্ণ বিশ্বের চাহিদার পঞ্চাশ শতাংশ টিকা ইতিমধ্যেই সরবরাহ করিয়াছে। ব্রিটেন ও ভারত এই অতিমারীতে হাতে হাত মিলিয়া কাজ করিয়াছে।' বিল গেটস বলিয়াছেন, 'আমি অভিভূত যে ভারত শুধু নিজের দেশের কথাই ভাবিতেছে না, সারা বিশ্বের দরজায় ভ্যাকসিন পৌঁছাইয়া দেওয়ার পরিকল্পনা করিয়াছে।' খুবই আনন্দের বিষয়, আমাদের দেশের দুইটি সংস্থার তৈরি টিকা কোভ্যাকসিন ও কোভিশিল্ড দেশের তিন কোটি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সম্মুখসারির করোনা যোদ্ধাদের বিনামূল্যে প্রদান করিবার কাজ চলিতেছে। দেশের মানুষ করোনাভীতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিক লড়াইকে একশ্রেণীর তথাকথিত রাজনীতিবিদ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। করোনা মহামারী প্রাদুর্ভাবের প্রারম্ভের দিনগুলিতে যখন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে নষ্ট করিয়া বিশ্বের সম্মুখে ভারতের সম্মানহানির চেষ্টা করিতেছিল, তখনও এই রাজনীতিবিদরা দেশবিরোধী শক্তিকে আড়াল ও সমর্থন করিয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী যখন দেশবাসীকে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সম্মিলিত শক্তির পরিচয় দিতে কাঁসর, ঘণ্টা বাজাইতে ও প্রদীপ প্রজ্বলন করিতে বলিয়াছিলেন, তখনও তাহারা উপহাস করিয়া দেশবাসীর মনোবলকে হতোদ্যোম করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। দেশবাসী সেইদিন মোদী-বিরোধীদের অপপ্রচারে কর্ণপাত না করিয়া জাতীয় সংহতির পরিচয় দিয়াছিলেন। দেশের বৈজ্ঞানিকদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে করোনা প্রতিষেধক আবিষ্কার হইবার পরও বিরোধীপক্ষের একই প্রকার কুৎসা শুরু হইয়াছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলিয়াছেন, 'অতীতের ন্যায় পুনরায় আমরা দেখিলাম, আমাদের দেশ যখনই বড়ো কেনো সাফল্য লাভ করে, তখনই বিপক্ষ দলগুলি বন্য রাজনীতির মাধ্যমে তাহার বিরোধিতা করিয়া সেই সাফল্যকে ছোটো করিবার প্রয়াস করিয়া থাকে। ইহার সাম্প্রতিক উদাহরণ হইল কোভিড ভ্যাকসিন আবিষ্কার।'

সুতরাং প্রশ্ন উঠিতেই পারে, আমাদের দেশের বিপক্ষ দলগুলি কি সরকার বিরোধী না রাষ্ট্রবিরোধী? করোনার মতো মহামারী কিংবা দেশের নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি লইয়া বিরোধীদের উচিত কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযাগিতা করার। বিরোধিতার জন্যই শুধু বিরোধিতা করা সুস্থ লক্ষণ নহে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইল, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকদলের নেতা-নেত্রীরাও কেন্দ্রীয় সরকারকে হেয় করিবার জন্য করোনা সংক্রান্ত গাইডলাইন মানিতেছেন না। তাহারা করোনার টিকা লইয়া সস্তা রাজনীতিতেই মাতিয়াছেন।

সুভাষিতম্

মাধুর্যমক্ষরব্যক্তিঃ পদচ্ছেদস্তু সুস্বরঃ।

ধৈর্যং লয়সমর্থং চ ষড়েতে পাঠকাঃ গুণাঃ।

কণ্ঠস্বরের মাধুর্যতা, অক্ষরের স্পষ্ট উচ্চারণ, যোগ্য স্থানে অন্তর, সুস্বর, ধৈর্য এবং তাল-লয় সহ বলা — আবৃত্তিকারের এই ছয়টি গুণ আবশ্যক।

নেতাজী নিয়ে মৌরুসিপাট্টায় আঘাত পড়তেই শুরু চিলচিৎকার

বিশ্বামিত্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে একটি বিতর্ক আবার প্রকাশ্যে এসেছে। বলাবাহুল্য, এই বিতর্কও অনভিপ্রেত। অনেকটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নেতাজীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বক্তব্য রাখতে উঠছিলেন তখন উপস্থিত দর্শকের একাংশ 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেন। ক্রোধে অগ্নিশর্মা মখ্যমন্ত্রী 'গরমেন্ট কা পোগ্রাম মে কুছ ডিগনিটি হোনা চাহিয়ে' বলে আর কিছু বলতে অস্বীকার করেন। নেতাজীকে অপমানের প্রসঙ্গ বাদই দিলাম, মঞ্চে তখন বসে দেশের প্রধানমন্ত্রী। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি ন্যূনতম সম্মানবোধ থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী এভাবে 'সিন ক্রিয়েট' করার ধৃষ্টতা দেখাতেন না। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির প্রতি তাঁর অসূয়া সবাই জানে, এই স্লোগান দেওয়ার অপরাধে নিরীহ মানুষের জেলযাত্রা পর্যন্ত হয়েছে। আসলে গত লোকসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর থেকেই 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান তাঁকে নিশি আতঙ্কের মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শোনানোর জন্য তৃণমূলিরা চারিদিকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। আর এই সুযোগে ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে কিছু 'বুদ্ধিজীবী' তকমাধারী লোকজন এবং তাদের পদলেহনকারী সংবাদপত্রগোষ্ঠী। তারা বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট তৈরি করে সারা ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার খেলাই নির্বিবাদে খেলে চলেছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, বুদ্ধিজীবীদের পূর্বজদের একাংশ নেহরুপন্থী কংগ্রেসি ঘরানার, অপরাংশ কমিউনিস্ট ঘরানার। যে নেহরুর জন্য নেতাজীকে কংগ্রেস ত্যাগ করতে হয়েছিল, তাঁর অন্তর্ধানের পর মনগড়া বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুকাহিনি রটানো হয়েছিল। তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর নেতাজীর বিবাহিত জীবনের আবিষ্কার, যাতে প্রমাণ করা যায় নেতাজী বিদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য গিয়ে নিজস্ব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের জীবনে অভস্ত ছিলেন। আর এসব কাজে নেহরু সাহচর্য পেয়েছিলেন কমিউনিস্টদের, যাদের মুখপত্র পিপলস ওয়ারে বৃহদাকার জাপানিদের সঙ্গে নেতাজীকে বামনাকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করে নোংরা কার্টুনে সংবাদপত্রের পাতা ভরিয়ে তোলা হয়েছিল। তাঁকে জাপানি প্রধানমন্ত্রী হিদেকি তোজোর 'কুকুর' বলা হয়েছিল। এইসব অপকীর্তির কথা কেউ ভুলে যায়নি।। সুতরাং এখন তাদের কেউ রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানের খেলায় নেতাজী-প্রেমে তদ্‌গত চিত্ত হলে কিংবা তৎকালীন কলকাতা পুর-নির্বাচনে নেতাজী-শ্যামাপ্রসাদ অনুগামীদের রেষারেষির ঘটনাকে সামনে এনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নেতাজী বিদ্বেষী বা সুভাষচন্দ্রকে শ্যামাপ্রসাদ বিরোধী সাজানোর চেষ্টা হলে এদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পূর্বজদের অপকীর্তি আড়াল করার ব্যর্থতাও সামনে চলে আসে।

'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ওঠায় মমতা ব্যানার্জি রাজনৈতিক কারণে অসন্তুষ্ট হতেই পারেন, কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান 'জয় বাংলা' তিনি সেই মঞ্চে তুললে তা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের অনুমোদন পায়। কারণ বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট তাতে তোলা সহজ হয়, এবং সেটা সহজ হলে ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভাজনও সহজ হয়। এক্ষেত্রে তারা দোহাই পাড়ে নেতাজীর মেজদাদা শরৎ চন্দ্র বসুর, যিনি অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মুসলিম লিগের কদর্য রূপ তখনো তাঁর সামনে আসেনি। সেই রূপ কী বীভৎস হতে পারে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তার সাক্ষী। একথা প্রমাণিত যে, শ্যামাপ্রসাদ সেদিন দূরদর্শিতার পরিচয় না দিলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কোনো অস্তিত্বই থাকতো না। যারা সেদিন 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানকে অবাঙ্গালি প্রভাব বলে বর্ণনা করেছেন, তাদের জন্য নেতাজীর ছাত্রাবস্থায় মা প্রভাবতীদেবীকে লেখা পত্রের অংশবিশেষ ঃ 'রামায়ণে সবই পবিত্র, সামান্য তৃণের বর্ণনা পর্যন্ত পবিত্র, কিন্তু হায়! সেই পবিত্রতা আমরা ধর্মত্যাগী বলিয়া আর এখন বুঝিতে পারি না' (সমগ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ)। একথা থেকেই স্পষ্ট যে, নেতাজী রামায়ণকে কী চোখে দেখতেন। তাই কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের পাতা ফাঁদে পা দেওয়াটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নেতাজী-ব্যবসায়ে স্বনামধন্য তাঁর উত্তরপুরুষরা অবশ্য ফাঁদটির পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছেন, প্রধামন্ত্রীর সঙ্গে নেতাজীভবনে আর কাউকে প্রবেশ করতে না দিয়ে। উদ্দেশ্য, নেতাজীর অন্তর্ধানের সুযোগে সেদিন তাঁর ভাবমূর্তির কালিমা লেপনকারীরা যাতে তাঁকে এখনো কুক্ষিগত করে রাখতে না পারে তার ব্যবস্থা পাকা করা। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সেদিন এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে তাঁর পরিবারের একাংশ লিপ্ত ছিলেন, তাদের উত্তরপ্রজন্ম সেই একই দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। নেতাজী নিয়ে এই মৌরুসিপাট্টায় আঘাত পড়তেই তাই এই চিলচিৎকার। □

'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ওঠায় মমতা ব্যানার্জি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান 'জয় বাংলা' স্লোগানে তিনি বাঙ্গালি সেন্টমেন্ট তোলার চেষ্টা করছেন।

‘জয় শ্রীরাম’ বললে গ্রেফতার করা উচিত

প্রিয় দিদিমণি,

সেদিন যাঁরা ‘জয় শ্রীরাম’ বলেছে তাঁদের গ্রেফতার করুন। হ্যাঁ দিদি, এখনই করুন। এ ধ্বনি মারাত্মক। কেন মারাত্মক তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি ওঠার পরই অযোধ্যায় বাবরের ধ্বংসের চিহ্ন মাটিতে মিশে গিয়েছিল।

‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি ওঠার পরেই সেই জমিতে ভব্য রামের নন্দির তৈরি শুরু হয়েছে।

‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি ওঠার পরেই দিল্লিতে পরিবার রাজ শেষ হয়েছে। কংগ্রেসমুক্ত ভারত জন্ম নিয়েছে।

‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি ওঠার পরেই তিনতালাক প্রথা মুছে গেছে, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারার অভিশাপ মুছে গিয়েছে।

উপাহরণ আরও দিদি। তাই ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি থেকে সাবধান। যাঁরা ওই ধ্বনি দিচ্ছে আপনার ভাষায় তাঁদের চাবকানো উচিত। কারণ, আমি দিদিমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ চাই না।

তবে দিদি, ছোটো ভাই হিসেবে একটা কথা বলছি। রাগ করবেন না প্লিজ। সেদিন আপনিও পালটা দিতে পারতেন। সবাই যখন ‘জয় শ্রীরাম’ বলছে তখন আপনিও জয় শ্রীরাম বলতে পারতেন। বলে বক্তৃতাটা দিয়ে দিলে বিপদ কম হতো। মুসলমান দাদাদের ভোট একটু অবশ্য কমে যেত। কারণ, মুসলমান দিদি-বোনেদের ভোট কিন্তু আর আপনার সঙ্গে নেই। তিনতালাক প্রথা নিষিদ্ধ করে দিয়ে নরেন্দ্র মোদী মুসলমান দিদি-বোনেদের কাছে টেনে নিয়েছেন।

কিন্তু দিদি, বিপদ আসন্ন। যা শুনছি

তাতে ‘জয় শ্রীরাম’ কথাটুকুর মধ্যে কোথায় ‘বেইজ্জতি’ আছে সেটা এখন আপনাকে বোঝাতে হবে। কারণ বিধানসভা ভোটে এটাই হয়ে যাবে বিজেপির প্রচারের লাইন। ওদিকে আবার মারাত্মক প্ল্যান তৈরি হয়েছে। আপনার ঠিকানায় এক লাখ ‘জয় শ্রীরাম’ লেখা পোস্টকার্ড পাঠানোর কর্মসূচি নিয়েছেন বিজেপির এক নেতা। দিল্লি বিজেপির মুখপাত্র তেজিন্দর সিংহ বাগ্গা জানিয়েছেন শুধু কালীঘাটের বাড়ির ঠিকানায় নয়, নবান্নেও পৌঁছে দেওয়া হবে এই কার্ডগুলি।

তিনিই জানিয়েছেন, ‘আমরা পোস্টকার্ডগুলিতে মমতাদিদির নাম এবং ঠিকানা লিখে সাধারণ মানুষের মধ্যে তা বিলি করছি। সকলে সেই কার্ডগুলিতে ‘জয় শ্রীরাম’ এবং নিজেদের নাম লিখে পাঠিয়ে দেবেন।’ দিদি, আমি বলছি কী, আপাতত কালীঘাটে আর নবান্নে পোস্ট অফিসের পিয়োনদের ঢোকা বন্ধ করে দিন। সেদিন ভিক্টোরিয়ায় কয়েকশো মানুষের ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি শুনে আপনি বক্তৃতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এবার যদি এত এত ‘জয় শ্রীরাম’ লেখা পোস্টকার্ড আসতে শুরু করে তাহলে তো আপনাকে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। প্রেসার চর চর করে উপরে দিকে উঠবে। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরবে।

আপনার মতো আমিও মনে করি ‘জয় শ্রীরাম’ বাঙ্গলার সংস্কৃতি নয়। ওটাও বহিরাগত। আপনি এটা যখন বলছেন তখন আবার খোদ সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে নেতাজীও রামভক্ত ছিলেন। এসব অবশ্য বিজেপির নেতারা খুঁজে খুঁজে বের করেছে। আমি নয়। আর বিজেপি নেতারা বলছেন, ‘ যদি কেউ ‘জয় শ্রীরাম’ বলে থাকে, তাহলে খারাপ লাগার কিছু নেই। এটা অভিবাদন। নমস্কার আর জয় শ্রীরাম একই। এটা শিষ্টাচার। কাউকে ‘জয় শ্রীরাম’ বলার জন্য জোর করা হচ্ছে না। ফলে খারাপ লাগার কিছুই নেই এখানে।’

ওসব ওঁরা বলুন। আপনি কিন্তু দিদি ওই ফাঁদে পা দেবেন না। কিন্তু কেউ কেউ বলছে আপনি ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন। এবার নাকি ভোটের প্রচারে আপনি যেখানেই যাবেন সেখানেই ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি শুনতে হবে। জনসভায় বক্তৃতা দেবেন কী করে? আমি ঘোর চিন্তায়। আমি ভীত।

‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি পশ্চিমবঙ্গকে দিদিমুক্ত করে দেবে না তো? □

মন্দির নির্মাণে রাষ্ট্রপতির দান ধর্মনিরপেক্ষতার লঙ্ঘন নহে

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ রামমন্দির নির্মাণার্থে ব্যক্তিগত পুঁজি দান করিতে পারেন কি না, এইরূপ একটি তর্ক উঠিয়াছে। রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিপরিচয় থাকিতে পারে না, তিনি স্বয়ং ভারতরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে তাঁরও ধর্মহীন, ব্যক্তিসত্তাহীন প্রতীকমাত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়; সুতরাং তিনি হিন্দু মন্দির নির্মাণার্থে আপন পুঁজি অর্পণ করেন কীরূপে— ইহাই প্রশ্ন। তুলিয়াছে একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা, ২০ জানুয়ারির সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলামে। তর্ক উঠিয়াছে— অতএব যুক্তি ও প্রতিযুক্তির অবতারণা অনভিপ্রেত নহে।

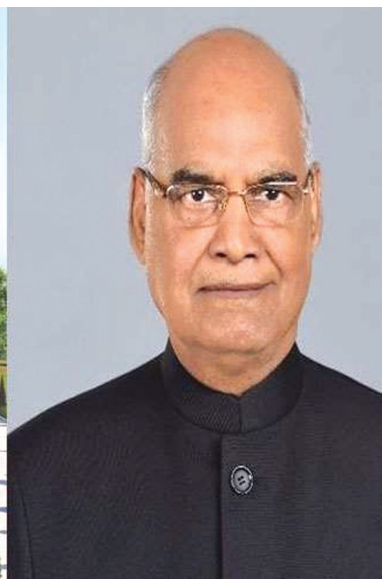

ভারতরাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো বহিরাগত ধারণা মাত্র নহে, ভারতবর্ষের তাহা অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। ধর্মনিরপেক্ষ হইবার জন্য একজন ভারতীয়কে প্রয়াস করিতে কিংবা ধর্মহীন ব্যক্তিসত্তায় পরিণত হইতে হয় না। আপন ধর্মকে ও আপন রিলিজিয়নকে অন্তরে বাহিরে ধারণ করিয়াও ধর্মনিরপেক্ষ হইবার নামই ভারতীয়ত্ব। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকগণ এদেশ ত্যাগ করিবার পূর্বে ভারতভূমির একটি অংশকে কোনো একটি রিলিজিয়নের মানুষের জন্য চিহ্নিত করিয়া গিয়াছিল, ভারতাত্মার উপর তাহা ছিল মারণাত্মক আঘাত স্বরূপ। ইহা ছিল এক অভাবতীয় পদক্ষেপ এবং ভারত দেশের অন্তর্নিহিত, স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মনিরপেক্ষতা বোধের অবমাননা। কিন্তু এই রূপ আঘাতও ভারতভূমিকে তাহার ধর্মনিরপেক্ষতা-ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। বিভাজন-পরবর্তী ভারতভূমিও তাহার অন্তর্ধর্ম বজায় রাখিয়াছে। যদি না রাখিত, তাহা হইলে বিভাজন-পরবর্তী ভারতবর্ষে সকল রিলিজিয়নের মানুষ স্বাধিকার-সহ নিশ্চিন্তে বাস করিতে পারিত না। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার পর ২৬ বৎসরকাল যাবৎ ভারতবর্ষ তাহার ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মটি পালন করিয়াছে নির্বিঘ্নে। ২৬ বৎসর পর আসিল আর এক মর্মান্তিক আঘাত। ভারতের সংবিধানের প্রিঅ্যাম্বলে লিখিয়া দেওয়া হইল ভারত দেশ নাকি 'সেক্যুলার'। এই একখানি 'সেক্যুলার' শব্দ লিখিয়া দিবার মাধ্যমে ভারতের অন্তর্লীন মূল্যবোধের যে কী পরিমাণ অপমান সেইদিন করা হইয়াছিল তাহার মর্মোপলব্ধি করিলে বোধ করি যে বা যাহারা এমন করিয়াছিল সে বা তাহারা তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। সিংহ যে সিংহই, তাহা বুঝাইতে তাহার ভালে 'সিংহ' লিখিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ১৯৭৬ সালে ভারতরাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দের না জানি কী হইল, ভারতভূমির ধর্মনিরপেক্ষতার চিরায়ত বৈশিষ্ট্যের উপর তাঁহাদের আস্থা আর রহিল না। সিংহের ভালে 'সিংহ' অথবা আকাশপটে 'আকাশ' লিখিয়া দিবার মতো করিয়া সংবিধানের প্রথম পৃষ্ঠায় দুইটি শব্দ তাঁহারা জোর করিয়া গুঁজিয়া দিলেন। অনাদি অতীত হইতে যে শব্দ কপালে না লিখিয়াও ভারত দেশ তাহার স্বভাব-ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াছে, অন্তর্লীন ভাববৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়াও বা বৈচিত্র্যজনিত কারণে পারস্পরিক রাজনৈতিক আকচাআকচি বজায় রাখিয়াও সকলের আত্মাকে একীভূত করিয়া লইবার যে মূল্যবোধ সে কদাপি ত্যাগ করে নাই, 'সেকুলার' শব্দ আসিয়া তাহার সেই অনায়াস-স্বচ্ছন্দ জীবনধারাকেই ব্যাহত করিল। ভারতীয়ের মনে প্রশ্ন জাগিল, 'লিখিয়া দিতে হইবে কেন?' ইংরেজি post শব্দে একটির স্থানে দুইখানি t লিখিলে বানান ভুল হয় মাত্র। পোস্ট বা খুঁটিটি অধিক শক্তপোক্ত হয় না। অনুরূপভাবে, ভারতের সংবিধানের প্রিঅ্যাম্বলে 'সেকুলার' শব্দ লিখিয়া, ভারতের অন্তর্ধর্মের অবমাননা করিয়া যে বিভ্রান্তি সেইদিন বিস্তার করা হইয়াছিল তাহারই ফলস্বরূপ বোধ করি আজিকার এই বিতর্ক।

ভারতবাসীর একাংশ বিভ্রান্ত বলিয়াই বোধ করি এমন ভাবনা তাঁহাদের রাষ্ট্রপতির ধর্মনিরপেক্ষতা বুঝি বা ক্ষুণ্ণ হইবে। বাস্তবে রাষ্ট্রপতির এই রূপ দান আদতে তাঁহার ভারতীয়ত্ব ধর্মের পালন। ভারতবর্ষ কাহাকেও ধর্ম পালনে বাধা দেয় না, এদেশে ধর্মপালন হইতে কাহাকেও বিরত থাকিতেও হয় না। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক বিবাদ, ক্ষুদ্রত্ব বা শত পারস্পরিক শত্রুতা সত্ত্বেও অন্তর্লীন ধর্মনিরপেক্ষতা- ধর্মটি হইতে এদেশ কদাপি বিচ্যুত হয় নাই। ভারতবর্ষ শত্রু মারিয়াছে, কিন্তু শত্রুর মনুষ্যত্বকে, তাহার অন্তরাত্মাকে অপমান করে নাই। বিবদমান শত্রুকেও মানুষ মানুষকে 'রাম রাম' বলিয়া সম্ভাষণ জানাইয়া থাকেন। মুসলমানও বলেন, খ্রিস্টানও বলেন। তাহা ভারতীয় বাগধারা, উহাতে রিলিজিয়ন নাই। 'রাম রাম' সম্ভাষণ এদেশের ভূমি স্পর্শ করিয়া, বাতাস বহিয়া, আকাশ ছাপিয়া, ভারতবাসীর মরমে ছাইয়া থাকে। ব্যবসায়ী গুনিতে গিয়া রাম, দুই, তিন, চার গণনা করে, জুয়াড়ি তাস বাঁটিতে গিয়া রামনাম নিয়া শুরু করে, মানুষ হতাশা ব্যক্ত করিতে 'হায় রাম' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠে। কেহ কাহাকেও ধিক্কার জানাইতে পর্যন্ত 'এ রামঃ' বলিয়া ওঠে। ভারতভূমি জুড়িয়া শ্রীরামচন্দ্র এমনভাবেই রহিয়াছেন ভারতবাসী মুক্ত হস্তে করিয়া দান দিতেও কার্পণ্য করিতেছে না। যথাসাধ্য দান দিবার পরও কোনো মুসলমান বলিতেছে মন্দির নির্মাণ কার্যে তাহাদের অবদান রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালির অবদানের ন্যায় যৎসামান্য। ইহাই ভারতধর্ম। রামমন্দির নির্মাণ ভারতবর্ষকে পুনরায় তাহার ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মের এক মহামহোৎসব উদ্‌যাপন করিবার সুযোগ দিয়াছে এবং ভারতবাসী বিপুল উৎসাহে সে উদ্‌যাপনে লাগিয়াও পড়িয়াছে। 'সেকুলার' শব্দ যে ঘা দিয়াছিল, তাহার ক্ষত সারাইয়া তুলিবার ইহা এক প্রয়াসমাত্র।

আপন রিলিজিয়ন অনুসরণে বাধা দিবার রীতি ভারত-রীতি নহে। এমন দাবি যে কেবলমাত্র আবেগের কথা নহে, তাহার প্রমাণ এদেশের সংবিধান। ভারতের সংবিধানের ২৫ ও ২৬ নং ধারা ভারতের স্বভাব-উদারতারই সাংবিধানিক অনুমোদন। যে উদারতা হইতে ভারতরাষ্ট্র সকলকে তাহাদের নিজ নিজ রিলিজিয়ন পালন, প্রসার ও প্রচারের অনুমতি দিয়াছে সেই উদারতা ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ধর্ম এবং যে মন্দির অযোধ্যায় নির্মিত হইতে চলিয়াছে, তাহা এদেশের সেই ধর্মনিরপেক্ষতা-ধর্মেরই পূতসৌধ। ভারতরাষ্ট্রের প্রতীক শ্রীরামচন্দ্রই ভারত-আত্মা। রাম ভিন্ন ভারতবর্ষ নাই। এদেশের নানা প্রান্তে রিলিজিয়ন নির্বিশেষে যে ঘোর কমিউনিস্ট নেতার নামও এই দেশে 'সীতারাম' হইয়া থাকে। রাম এদেশে রিলিজিয়ন নহেন; ভারতধর্ম। সেই দেশে রামনাথ কোবিন্দ যদি রামমন্দির নির্মাণার্থে আপন পুঁজি দান করিয়া থাকেন তবে তাহা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা- ধর্মের উদারতার উদ্‌যাপন। ভারতের প্রথম নাগরিক হিসাবে সে উদযাপনের শুভারম্ভ করিয়া দেওয়া রাষ্ট্রপতির পরম কর্তব্য ছিল যাহা তিনি পালন করিয়াছেন। এই রূপ উদ্‌যাপনের সুযোগ পাইলে ভারতীয় ছাড়িবে কেন? ছাড়ে নাই বলিয়াই রামমন্দির নিধি সমর্পণ অভিযানার্থে কর্মকর্তাগণ রিলিজিয়ন নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের নিকট যাইতেছেন এবং রিলিজিয়ন নির্বিশেষে ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়া ভারতাত্মার সহিত পরিচিত হইবার পূর্বেই অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানে অবস্থিত মন্দিরটি ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল কে বা কাহারা। পরবর্তীতে তাহাদের বংশধরেরাও ধীরে ধীরে প্রয়াস করিয়াছে ভারতের মূলস্রোতের সহিত মিশিবার। কিন্তু পাঁচশত বৎসর পূর্বে যে ভুল তাহারা করিয়াছিল তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার দায় ভারতবর্ষের ছিল। ভারতের প্রথম নাগরিক হিসাবে সে প্রায়শ্চিত্তের শুভারম্ভ করিয়া রাষ্ট্রপতি ভারতবাসীকে দায়মুক্ত হইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাকে অভিনন্দন।

(লেখিকা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকটিভিস্ট)

ধলাই জেলায় জনস্বাস্থ্য ও কারীগরী দপ্তরের পানীয় জল সরবরাহের সফলতার চিত্র আমবাসা, গঙ্গানগর, মনু, ছাওমু, ডুম্বুরনগর, রইস্যাবাড়ী ব্লকে নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

Sl. No.	Name of Block	Total target of FHTC (Retrof-ittings & new source)	Block wise target of FHTC for 2020-21	Block wise tartet of FHTC from New source 2020-21	No of FHTC provided as on 1.4.20	No of FHTC provided as		To be provided	
						Physi-cally	As per IMIS	Physi-cally	As per IMIS
1.	Ambasssa	4569	3738	831	1056	2809	2861	929	876
2.	Ganganagar	1196	836	360	262	316	283	520	553
3.	Manu	10726	10546	180	2117	2094	1964	8452	8582
4.	Chawmanu	2269	1489	780	605	1407	1355	82	134
5.	Dumburnagar	4640	3970	670	2799	1897	1834	2073	2136
6.	Raishyabari	2395	1775	620	572	786	743	989	1032
	TOTAL	25795	22354	3441	7411	9309	9041	13045	13313

Advt.

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বড়ো বাধা প্রাদেশিকতার রাজনীতি

শেখর সেনগুপ্ত

সারা বিশ্ব করোনাক্রান্ত। আমার মতো বহু প্রবীণই ঘরবন্দি। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে ডুব দিলে ভেতরটা একসময় গমগমিয়ে ওঠে কিছু নেতা-নেত্রীর হুংকার, মিষ্টি ধূর্তামি এবং নীতিবোধের নগ্ন বিলুপ্তির হদিশ পেয়ে। এই বিষাদে-বিস্বাদে ভরপুর সময়েও ক্ষমতালোভীদের এই বহর দেখে নিজেই লজ্জানুভব করি। নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা কানে এলে এঁদের মুখের রং বদলায়— কখনো কালো, কখনো লাল। অতঃপর একজন নাগরিক হিসেবে তাঁদের প্রতি আমার অনুরোধ, অনর্গল আত্মপ্রশংসা ও মিথ্যাভাষণের প্রবণতা থেকে নিজেকে বের করে আনুন। মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বড়ো তিক্ত, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানাবার আপনাদের যে বিদ্যা, নির্ভেজাল সাধুজীবনে থাকবার বিষয়ে অনভ্যস্ত মানুষও আর তা সহ্য করতে পারছে না। যেটা সত্যি তাকে স্বীকৃতি দিন, আর যেটা মিথ্যা, তাকে মিথ্যা বলেই মেনে নিন। যেমন ধরুন, এটা সত্যি যে গত তেইশ বছর ধরে ভারতের গড় জিডিপি বৃদ্ধির হার সাত শতাংশের আশপাশেই রয়েছে। এবার আপনি যদি আপনার রাজনৈতিক ভাষণে ওই গড়কে পাঁচে নামিয়ে এনে আপন রাজ্যের জিডিপি-কে সাড়ে সাত বলে কৃতিত্বের বহর বাড়াতে চান, আপনার বচন-নৈপুণ্যকে নির্ভেজাল হিসেবে মেনে নিতে যাবো কোন আক্কেলে?

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে আমি কলকাতার একটি সুপরিচিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমন্ত্রিত ফ্যাকালটি হয়ে জনা পঞ্চাশেক তরুণ- তরুণীকে বলেছিলাম, 'আমাদের দেশ আর কতকাল 'উন্নয়নশীল'- এর তকমাটাকেই বহন করে বেড়াবে? এ অনুতাপ কি চিরস্থায়ী? আমরা কী কোনওদিন শিল্পোন্নত দেশের শিরোপা লাভ করতে পারবো না তোমাদের মতো সম্ভাবনাময় তরুণরা থাকতে?' আজ জীবনের প্রায় প্রান্তিক সীমায় পৌঁছে আমি আনন্দিত যে, আমাদের দেশ এখন অন্তত 'শিল্পায়িত' স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে। এর জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রয়াস ও ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। আজ উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে নবীন প্রজন্মের একটা অংশ কোথাও কোথাও প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন মেধা ও পরিশ্রমের জোরে, হৃদ্যতার বাতাবরণে। সেই সঙ্গে এটাও কিন্তু অনস্বীকার্য সত্য যে, আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে তরুণ সমাজের কাছে কর্মহীনতার জ্বালা মারাত্মকভাবে ক্রমবর্ধমান। পূর্ণ বেকারি, অর্ধ বেকারি, ছদ্ম বেকারি— কোন ভাষায়, কোন হরফে যে এদের ব্যাখ্যা করবো, বুঝে উঠতে পারি না। রাজ্যে প্রকৃত শিল্পায়ন, নগরায়ণ, প্রশিক্ষায়ন না করতে পারলে নিকট ভবিষ্যতে কেবল নেতা-নেত্রীদের কথামতো চিড়া ভিজবে না।

প্রয়োজনীয়তা হলো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রসার। কেন বিশেষ বিশেষ কয়েকটি রাজ্যে এর অভাব? তার উত্তর একটাই, সেখানকার ক্ষমতাশীল দলের নেতৃত্বে প্রচুর গলদ, দুর্নীতি আর কুৎসিত রাজনীতি।

হাজার কয়েক অনুগামীকে নিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করে মাইল কয়েক হেঁটে এলাম,--- রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরে অবস্থানরত সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকরা এইসব দৃশ্য দেখে পুলকিত হবার বদলে এখন বিরক্তই হন। যেখান দিয়ে তারা ছুটছেন, সেখানকার রাস্তাঘাটের অবস্থাটা একবার দেখুন। ওইগুলির মেরামতিতে হাত দিন বরং রাজ্যের কিছু বেকার ছেলেকে কাজে লাগিয়ে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত পুরুষ ও নারীদের সংখ্যা না বাড়াতে পারলে কেবল দুর্নীতিতে মোড়া সরকারি অনুদান কিংবা চটুল ফুর্তিতে মজে থাকবার জন্য মুঠো মুঠো টাকা গুঁজে দিলে এ রাজ্যের প্রকৃত উন্নতি কিছুই হবে না, পরিবর্তে রাজ্যময় বিস্তারিত হবে ভয়াবহ অরাজকতা, হিংস্রতা এবং বিকট মিথ্যাচার। একাধিক চিন্তাশীল মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁরা সত্যি খুবই হতাশ। এখানে একটি তথ্য জানাই। আমাদের দেশে কিন্তু এই মুহূর্তে প্রায় ৫০ শতাংশ কর্মক্ষম মানুষই কোনও না কোনও প্রকল্পে বা কর্মে স্বনিযুক্ত এবং তাঁদের ৯০ শতাংশই কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পতাকাবাহী নন, তাঁরা যুগপৎ নিরপেক্ষ ও অসংগঠিত। ব্যক্তি বা দলের সততা ও কুশলতা দেখে তাঁরা ভোট দেন। সদ্য অতীত ২০২০ সালে দেশে এরকম সচেতন নাগরিকদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটিতে। তাঁরা আত্মপ্রত্যয়ী। তাঁরা দেশপ্রেমী। তাঁরা প্রদেশিকতাকে উপেক্ষা করে থাকেন। তাঁদের যুক্তিযুক্ত ভাবনায় দেশ একটাই, যেখানে এলোমেলো জটলার মধ্য থেকে এক প্রদেশের মানুষ অন্য প্রদেশের লোককে 'বহিরাগত' বলে চিৎকার জুড়ে দিলে ক্ষোভে ও বিস্ময়ে তারা হতবাক হয়ে যান। ক্ষণিকের জন্য হলেও তাঁরা ভাবেন, রাজনীতির চরিত্র যাঁদের এই রকম, তাঁরা

ফঃ ২

তো সামগ্রিকভাবে দেশের ঢের সর্বনাশ করতে সক্ষম।

আদত প্রয়োজনীয়তা হলো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রসার। এখনও ওই প্রসার অবশ্যই অপ্রতুল। কেন বিশেষ বিশেষ কয়েকটি রাজ্যে ওই অভাব দুনিয়া ছাড়া? তার উত্তর একটাই, সেখানকার ক্ষমতাশীল দলের নেতৃত্বে প্রচুর গলদ, কুৎসিত দুর্নীতি। কেবল ব্যক্তি বিশেষকে মাথায় তুলে নর্তনকেই সেই দল তাদের মুক্তকচ্ছ আদর্শ বলে মনে করে। উদাহরণের অভাব নেই। পার্শ্বশিক্ষকদের হাহাশ্বাস, এখানে ওখানে নবীনদের জটলায় সরকারি অনুদানে মদ্যপানের হিড়িক, বেকারিত্বের ছয়লাপ, সর্বত্র কেবল কাটআউট আর কাটআউট। আমি যখন নাৎসিকবলিত জার্মানির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বাংলাভাষায় লিখতে ব্রতী হই, তখন বহু তথ্যসূত্রে আমি এই ছবিগুলিকেই দেখতে পেয়েছিলাম। কী করে আমি আর উঁচু ধারণা পোষণ করতে পারি এই রাজ্যের শাসক দলের?

কেন্দ্রীয় সরকার যুবশক্তির যোগ্যতা বৃদ্ধির যে চেষ্টা করে চলেছে, বহু ক্ষেত্রেই তা লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছে কিছু রাজ্যে ইত্যাকার পরিবেশ- পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার জন্য। নরেন্দ্র মোদীর 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্প আরও বৃহৎ সাফল্য পেতো, যদি কতিপয় রাজ্যে এই জাতীয় ঝুট-ঝামেলা, পচনপ্রীতি প্রাধান্য লাভ না করতো। ASSOCHAM–TISS-এর সমীক্ষায় এটাই উঠে এসেছে। ব্যাপারটা আরও কমপ্লিকেটেড হয়ে উঠতে পারতো, যদি না ভারত সরকার বছর তিনেক আগে একটি পৃথক মন্ত্রক না গড়তেন। নাম সংক্ষেপে MSDE। এই মন্ত্রক প্রশিক্ষণ প্রদানের ফুটাটুটা অংশগুলির মেরামত করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ব্যারিকেড অনেক। দু'-একটি রাজ্যে সরকারের অহমিকা ও ক্ষমতা হারাবার ভীতি এতই প্রবল যে, বিস্তর সম্ভাবনার ধ্বংসাবশেষ নজরে আসে এবং ভাবলে গা শির শির করে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বর্ধমানের কলানবগ্রামে যে প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে গেছেন, আমি একাধিকবার সেখানে গিয়েছি এবং মুগ্ধতাজড়িত সুখস্মৃতি নিয়ে ফিরেছি। যদি সিঙ্গুর থেকে টাটাকে গলাধাক্কা না দেওয়া হতো, আজ সেখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণকেন্দ্রও গড়ে উঠতো। আমি এক সময় অফিসের কাজে জামশেদপুরে মাস দুয়েক ছিলাম এবং প্রত্যক্ষ করেছি ওই নির্মাণযজ্ঞে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানের কী ব্যাপক ব্যবস্থাপনা, যেখানে হোমসিকনেকের ব্যাপারই নেই এবং চরিত্রে সর্বভারতীয়। আছে মকর ও মণির মতো নিখাদ দেশপ্রেম। প্রসঙ্গত জানাই, সময়টা আবার ছিল ১৯৭১ সাল। পাকিস্তানের ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করবার পর ১৯৭১-এর সেই শীতার্ত দিনটিতে হাজার হাজার তরুণের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠেছি। প্রাদেশিকতার কুৎসিত লালন-পালন গ্যারেজবদ্ধ হয়ে সেদিনও ছিল, আজও আছে।

মন্ত্রক MSDE-এর দায়িত্ব দ্বিবিধ— (ক) কর্মীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো, (খ) কর্মীদের আরও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান। দেশে হরেক কিসিমের প্রশিক্ষণের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কিন্তু এই রাজ্যে তো শিল্প যতটুকু আছে, সবই প্রায় বুঝি নিঃশ্বাসজনিত দুর্বলতায় ধুকছে। ফলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি এখন প্রায়শ মাছি তাড়াবার মতো অবস্থায়। যে কয়েকটি সেন্টারকে কয়েক বছর আগে আমি দেখে এসেছি, নীচে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরলাম :

● বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৯। প্রশিক্ষণের বিষয় : ই ডি পি (Effecience Development Programme এবং ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং)। প্রায় আড়াই দশক আগের আমি এখানে বিশেষ আমন্ত্রিত ফ্যাকালটি হিসেবে ক্লাস নিয়েছি কয়েকবার।

● ক্যালকাটা ইউথ সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট সেন্টার, বীরেন রায় রোড (ওয়েস্ট), বেহালা চৌরাস্তা, কলকাতা-৮। প্রশিক্ষণের বিষয় : ইডিপি এবং বিবিধ প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ। এখানেও আমাকে একাধিকবার নিয়ে আসা হয়েছে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে।

● লেদার টেকনোলজি, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-১০। প্রশিক্ষণের বিষয় : চর্মশিল্পজাত দ্রব্যাদি নির্মাণের প্রশিক্ষণ।

● ওয়েস্টবেঙ্গল কন্সালটেন্সি অরগানাইজেন (ওয়েবকন), চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার (৪র্থ তল), ৩৩, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-১। প্রশিক্ষণের বিষয় : ইডিপি এবং ম্যানেজমেন্ট। এখানেও আমি এসেছি কয়েকবার ক্লাস নিতে। এছাড়াও রয়েছে আরও কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যেগুলির তৎপরতা যে পূর্বাপেক্ষা ম্রিয়মান, সেই সত্যোপলব্ধি আমার হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প নির্মাণের দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গ যে অনেক পিছিয়ে পড়েছে, এটা বুঝতে দুর্জ্ঞেয়, গূঢ় অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন হয় না। নির্বাচন অতি নিকটবর্তী। যে সরকার ক্ষমতায় বসবে, তাদের নিকট আগাম আবেদন, কোনও উদ্ভট তথ্য দেবেন না। নাগরিকরা মূর্খ নন, যা কিছু শ্রবণগোচর হবে, তাকেই অব্যর্থ সত্যিরূপে মেনে নেবার দিন এখন অতীত।

ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ— বহুবিধ বিষয়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের একাংশ হয়ে উঠছেন স্বয়ং উদ্যোগপতি। এই ক্ষেত্রে নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে আমার মনে উদ্ভব হয়েছে কয়েকটি পরামর্শ, যাদের এখানে তুলে ধরলাম :

(ক) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ তথা পরিশ্রমী প্রশিক্ষকরা যেন কর্তব্যপালনে নিজেদের উজার করে দেন। প্রয়োজনে ভিন্ন রাজ্য থেকেও কালেভদ্রে ফ্যাকালটিকে আনা যেতে পারে প্রশিক্ষণলাভে আগত নবীন বয়সিদের বুদ্ধি চাতুর্য এবং অভিব্যক্ত বাসনাকে বাস্তবায়িত করবার পথ দেখাতে।

(খ) প্রশিক্ষণের স্থানে লিঙ্গবিচার চলে না। তরুণ-তরুণীদের যা দরকার, তা হলো স্বচ্ছ উচ্চাশা, পরিশ্রম করবার মানসিক প্রস্তুতি এবং সাফল্যের হদিশ পাবার পরও নিরভিমানতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

(গ) প্রশিক্ষণের সময়সূচিতে থাকতে হবে নমনীয়তা এবং প্রাধান্য দিতে হবে ইংরেজির পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষাকে।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং অর্থনীতিবিদ)

‘মরিচঝাঁপি’ বামফ্রন্টের কলঙ্কজনক অধ্যায়

হীরক কর

বামফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়টির নাম ‘মরিচঝাঁপি’। যে অধ্যায়টি নির্মমভাবে শেষ হয় ১৯৭৯ সালের ১৬ মে। যার শুরুটা ১৯৭৯ সালের ২৬ জানুয়ারি। ভারতের পবিত্র অখণ্ডতা ভঙ্গকারী, বিদেশি শক্তির দালাল হিসেবে উল্লেখ করে ‘নীচু’ শ্রেণির একদল মানুষকে উচ্ছেদ করার অভিযান চলে এই সময়টাতে। উচ্ছেদ অভিযান শেষ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন মানবতার পক্ষে কথা বলা বাম-বুদ্ধিজীবীরা। কোনো ঘোষণা ছাড়াই মরিচঝাঁপিতে আর্থিক অবরোধ চাপিয়ে দেয় রাজ্য সরকার। ১৯৭৯ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রায় তিরিশটি পুলিশ লঞ্চ এবং দুটি বিএসএফ স্টিমার মরিচঝাঁপির চারপাশে চক্কর কাটছিল, যাতে কোনো বাসিন্দা পাশের কোনো দ্বীপ থেকে নৌকা করে খাবার, জল-সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী না আনতে পারেন। তা সত্ত্বেও যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন, পুলিশের লঞ্চ সাত তাড়াতাড়ি হামলা করে তাঁদের নৌকা ডুবিয়ে দেয়। অগত্যা, তাঁরা সাঁতরে দ্বীপে ফিরতে বাধ্য হন। কয়েকজনকে থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বহু বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থী তদনীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। প্রথম সারির উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থীরা সহজে কলকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এলাকায় নিজেদের ঠিকানা নিশ্চিত করতে পারলেও পরবর্তী সারির বিশাল জনসংখ্যার নিম্নবিত্ত শ্রেণীর নমঃশূদ্র হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়নি। বলপূর্বক তাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দণ্ডকারণ্যের শিলাময় অঞ্চলে

জ্যোতি বসুর নির্দেশেই মরিচঝাঁপিতে ঘটেছিল গণধর্ষণ- গণহত্যা। এই গণহত্যার এত দশকের পরেও মৃতের সঠিক সংখ্যা নিয়ে আজও দ্বিমত দেখা যায়। কমিউনিস্ট সরকার পুলিশের গুলিতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করলেও, ঘটনার শিকার এবং স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী ও বিভিন্ন তথ্যসূত্র এই সংখ্যা ৫০০ থেকে ১০০০ ছিল বলে এখনও দাবি করে।

পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। যার বেশিরভাগই ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। তদানীন্তন রাজ্যের মন্ত্রী, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের রাম চ্যাটার্জি দণ্ডকারণ্যের শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং তাদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনার মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলেন। ভিন রাজ্য হওয়ায় ভাষার বৈচিত্র্য এবং দণ্ডকারণ্যের ঘন জঙ্গল, খাবার জলের অপ্রতুলতা ও

ম্যালেরিয়া ডায়রিয়া-সহ অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে ১৯৭৮ সালে বিপুলসংখ্যক শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে শুরু করে। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার তাদের রাজ্য শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনে। এখন যেমন এনেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শরণার্থীদের দেশের নাগরিকত্ব প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। প্রায় ১,৫০,০০০ শরণার্থী দণ্ডকারণ্য ছেড়ে আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এলে উদ্বাস্তুদের কয়েকজনকে আটক ও বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু অনেকেই পুলিশি বেষ্টনী উপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে পেরেছিল। আর যারা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে পারেনি, সেই ফেরত আসা শরণার্থীরাই মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেয়। এবং নিজেদের উদ্যোগে সেখানকার জঙ্গল পরিষ্কার করে বন্যা থেকে বাঁচার জন্য বাঁধ নির্মাণ, মাছ চাষ ও চাষাবাদের ব্যবস্থা করে ওই দ্বীপে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে শুরু করে।

মরিচঝাঁপি মূলত একটি দ্বীপ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একটি দ্বীপ এটি। সুন্দরবনের উত্তরভাগে অবস্থিত ১২৫ বর্গমাইলের একটি দ্বীপ মরিচঝাঁপি। যেখানকার অধিকাংশ জায়গা ছিল শ্বাপদসংকুল। মানুষের বসবাসের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে সেখানে মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা করা দুরূহ কোনো কাজ ছিল না। এটি সুন্দরবনের সুন্দরী, গড়ানের বনভূমি, যার এখানে-সেখানে নারকেল গাছ। এখানকার জমি জলকাদা আর শীর্ণকায় উদ্ভিদে ভরা। ব্রিটিশরা যখন ভারতে ছিল, তখন থেকেই তারা এখানকার মানুষদের মনে এবং চেতনায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ হয়। কাছের মানুষদের সঙ্গে ভয়ানক লড়াইয়ের সাক্ষী হয় এখানকার মানুষজন। স্বাধীনতা পাওয়ার সময় ভাগ হয়ে যায় শান্তিকামী এই এলাকাটি। এর ফলে এখনকার বাংলাদেশ থেকে বহু বাঙ্গালি শরণার্থী হিন্দু পরিবার তাদের প্রিয় আবাস ছেড়ে পাড়ি দেন পশ্চিমবঙ্গে। তাদের মধ্যে যারা উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তারা সহজেই আশ্রয় পান কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। তাদের সাদরে গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু বিপদে পড়ে যান নিম্নবিত্ত শ্রেণীর নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুরা। ভদ্রলোক বাঙ্গালি

মরিচঝাঁপি থেকে জীবিত ফিরে আসা সফল হালদার।

উদ্বাস্তুদের কলোনিতে তাদের ঠাঁই হয় না। পরবর্তী সময়ে 'দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট' গড়ে উঠলে এদের পাঠানো হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু দূরে দণ্ডকারণ্যে--- মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশার মালকানগিরি এবং ভারতের ১৬৪টি দুর্গম প্রান্তে। এরা মূলত হতদরিদ্র কৃষিজীবী, কেউ বা মুচি, কেউ কাজ করতেন দিনমজুর হিসেবে।

দণ্ডকারণ্যের পাথুরে জমি, শুকনো মাটি এবং অসহ্য খরায় তপ্ত বনভূমি বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এছাড়াও তাদের অনেককেই এমন সব পাহাড়ি এলাকায় ফেলে আসা হতো, যেখানে ছিল হিংস্র সব প্রাণীর আনাগোনা। সেখানে ছিল না পানীয় জলের ব্যবস্থা। মারা পড়েছেন সেখানকার অনেক বাসিন্দা। এসব মরদেহ ট্রাকে করে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হতো। সেখান থেকে ১৯৬৪ সালে বেশ কিছু পরিবার কুমিরমারি নামক এলাকা পেরিয়ে প্রথম আশ্রয় নেন মরিচঝাঁপিতে।

এর অনেক আগে থেকেই দেশভাগের পর তাদের অধিকার নিয়ে বেশ জোরালো আওয়াজ তোলেন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলো। এই দলের বুদ্ধিজীবীরা তখন ব্যক্তিগত, সরকারি ও বেসরকারি জমি দখল করে এসব উদ্বাস্তু শরণার্থীদের জন্য বস্তি নির্মাণের পক্ষে আন্দোলন করছেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জ্যোতি বসু-সহ আরও অনেক নেতা সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন। এসব শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গেই রাখার জন্য তাদের তখন প্রবল আকুতি। তারা জোর আবেদন জানান যে, সরকারের অভিপ্রায় থাকলে এটি সম্ভব।

১৯৪৭ সালের পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওইসব নেতার অনেকেই হাজির হন দণ্ডকারণ্যে শরণার্থীদের এসব ক্যাম্পে। উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল এবং তার সঙ্গীদের বলা হয়, বামেরা ক্ষমতায় এলে শরণার্থীদের সুন্দরবনের নিকট একটি সুন্দর জনপদে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। অনেকে তখন মরিচঝাঁপির নাম প্রস্তাব করেন। এসব কথা শুনে আশ্বস্ত হন অবহেলায় থাকা লোকজন। শেষ পর্যন্ত বামেদের আশ্বাসে দুই যুগের উদ্বাস্তু জীবন শেষে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হিন্দু শরণার্থীরা বাংলাদেশ লাগোয়া সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে শেষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। নির্বাচনে জেতার জন্য উদ্বাস্তু বান্ধব জ্যোতি বসুর বাম দলই তাদের ডেকে এনেছিল। জ্যোতি বসু নিজে একসময় উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে দরবার করেছেন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের কাছে। নিজের ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করেছেন, সম্ভাব্য পুনর্বাসনের রূপরেখা দিয়েছেন। যার মধ্যে সুন্দরবনও ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ভিলাইয়ে এক জনসভায় নিজে বলেছেন, সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে, উদ্বাস্তুদের সেখানে নিয়ে যাবেন। ক্ষমতায় আসার বছর খানেক আগে সিপিএম সরকারের মন্ত্রী ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা রাম চ্যাটার্জি-সহ কয়েকজনকে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে এসব উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গ ফেরার আমন্ত্রণ জানানো হয়। বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ কোটি বাঙ্গালি দশ কোটি হাত তুলে তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। মালকানগিরিতে রাম চ্যাটার্জি আবেগঘন বক্তৃতায় বলেন, মাতৃভূমি তোদের দুহাত তুলে ডাকছে, ওরে অবুঝ সন্তান, তোরা ছুটে আয়। মিঠে সেসব মিছে কথাকে সত্যি ভেবে ভুলেছিল উদ্বাস্তুরা।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে উদ্বেল হয়ে ওঠে তারা। এবার তারা ফিরতে পারবে, এমন জায়গায় যেখানে তাদের মতো বাংলায় কথা বলে মানুষ। ১৯৭৮ সালের মার্চ নাগাদ সহায় সম্বল যা ছিল বিক্রি করে দণ্ডকারণ্য থেকে স্বপ্নের এলডোরাডোতে রওনা হয় দেড় লক্ষ উদ্বাস্তু। কিন্তু সেখানে অপেক্ষায় ছিল নিষ্ঠুর করা বাস্তবতা। নির্বাচনের আগের বামফ্রন্ট আর ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের কথাবার্তায় তখন ব্যাপক ফারাক। বদলে গেছে তাদের পলিসি। নেতারা বলেন, তারা বললেই চলে আসতে হবে নাকি! পুলিশ পিটিয়ে

খেদালো অনেককে, জেলে পুরল অনেককে। ভাঙা হৃদয় নিয়ে অনেকে ফিরে গেলেন দণ্ডকারণ্যে। কিন্তু মরিয়া কিছু মানুষ থেকে গেলো। উদ্বাস্তু সমিতি অনেক আগেই খোঁজখবর নিয়ে বসত গড়ার জন্য পছন্দ করে এসেছিল মরিচঝাঁপি, যার নাম দিয়েছিলেন বাম নেতারাই।

মরিচঝাঁপিতে যাঁরা আশ্রয় নিলেন তাঁদেরও কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। জ্যোতি বসু উদ্বাস্তু নেতাদের বললেন, যাচ্ছো ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের কোনো রকম সহায়তা করা হবে না। যা করার নিজেদেরই করে নিতে হবে। উদ্বাস্তুরা মেনে নিয়েছিল তা। সাত মাসের নিরলস পরিশ্রমে সোনা ফলালেন তারা। আবাদি জমিতে ফসল ফলানোর পাশাপাশি মাছের ভেরি করে বছরে ২০ কোটি টাকা সরকারকে লাভ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মরিচঝাঁপির সাফল্য উঠে এলো সংবাদমাধ্যমেও। নিজেরাই সেখানে গড়ে তুললেন জনপদ। রাস্তা তৈরি করলেন, তারা তখন নদী থেকে মাছ ধরে খান, বড়ো মাছ পেলে পাশের বাজারে বিক্রি করেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তায় নিজেরাই স্কুল গড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন নতুন করে।

কোথায় যেন জ্যোতি বসুর অহমে লাগল। কিন্তু শরণার্থীদের স্বীয় উদ্যোগে এই পুনর্বাসন তিনি মেনে নেয়নি। তাই ওই এলাকাকে সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে শরণার্থীদের এই বসবাসকে আইনের লঙ্ঘন হিসেবে বিবৃতি দিয়েছিলেন।

কোনো রকম সরকারি সাহায্য ছাড়া, পার্টির আনুকূল্য ছাড়া একটা জঙ্গলে একদল অশিক্ষিত হতদরিদ্র মানুষ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে এটা হয়তো তার মার্কসবাদের নীতির লঙ্ঘন। এবং এটা উদাহরণ হয়ে উঠলে বামপন্থীদের ব্যাপক সমস্যা। নির্দেশ পাঠালেন, এদের জায়গা ছাড়তে হবে। অজুহাত দিলেন, এরা সুন্দরবনের পরিবেশ নষ্ট করছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অভয়ারণ্য এদের কারণে বিপন্ন। সব যুক্তিই অযৌক্তিক ছিল। রিজার্ভ ফরেস্টের মানচিত্রে মরিচঝাঁপির ওই জায়গাটুকু অন্তর্ভুক্ত ছিল না কোনোকালেই। সিদ্ধান্তটা সার্বিকভাবে আরেকটু আগেই নেওয়া হয়েছিল।

১৯৭৮-এর ১ জুলাই সিপিএমের রাজ্যকমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো— যেসব উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে হলেও তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। চলল নারকীয় তাণ্ডব। বামফ্রন্টের শরিকদলের নেতারাই যাকে বর্ণনা করেছেন 'জালিয়ানওয়ালাবাগকেও হার মানানো তাণ্ডব' বলে।

বাঘ নয়, বামফ্রন্ট সরকারই খেলো তাদের। রাতের আঁধারে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো মরিচঝাঁপি থেকে। পাঠিয়ে দেওয়া হলো দণ্ডকারণ্যে আবার। আর সেই রাতের আঁধারে কতো লোক মারা পড়লো তা কেউ জানে না। অভিযোগ আছে বস্তায় করে লাশ নিয়ে যাওয়া হয় টাইগার প্রজেক্ট, বাঘের খাদ্য হিসেবে। বাকিগুলো ফেলে দেওয়া হয় গভীর সমুদ্রে।

জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার মরিচঝাঁপি দ্বীপের বাঙ্গালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। কোরানখালি নদীতে পুলিশি অবরোধ বসানো হয় যাতে করে মরিচঝাঁপি দ্বীপের শরণার্থীরা যেন নদী পার হয়ে পাশের কুমিরখালি গ্রামে ওষুধ, খাদ্যশস্য ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য কিনতে যেতে না পারে।

১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি দুপুরের দিকে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ দ্বীপের মধ্যে ঢুকে উদ্বাস্তুদের হত্যা করার জন্য লাগাতার গুলি চালাতে শুরু করে। হত্যার পর পুলিশ ও সিপিএমের দলীয় কর্মীরা মৃতদেহগুলোকে নদীতে ফেলে দেয়। আবার অনেকেরই নদী সাঁতরে পালাতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হয়।

গণচিতার প্রস্তুতি।

ঘটনার পঞ্চাশ দিনের মাথায় কলকাতা হাইকোর্ট মরিচঝাঁপি দ্বীপে খাবার জল, প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং ডাক্তারদের প্রবেশের নির্দেশ দেয়। শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়ে না পেরে উঠে তৎকালীন রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার মে মাসে গায়ের জোরে দ্বীপটিকে খালি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের ওই দ্বীপে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। পুলিশের সহায়তায় দলীয় ক্যাডাররা মে মাসের ১৬ তারিখ ৩০০টি পরিবারের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর দ্বীপে পড়ে থাকা অবশিষ্ট শরণার্থীদের পুনরায় মালকানগিরি (ওড়িশা), মানা, কুরুত (মধ্যপ্রদেশ) ও আদিলাবাদে (উত্তর প্রদেশ) জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আবার কিছু কিছু শরাণার্থী পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কদম্বগাছি, মালতিপুর, বারাসাত, বর্ধমান, ঘুটিয়াশরিফ, হিঙ্গলগঞ্জ ও ক্যানিং-এ আশ্রয় নেন।

গরিবের স্বার্থরক্ষাকারী জ্যোতি বসুর সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। পানীয় জল ও খাবারের সরবরাহ বন্ধ করে দ্বীপে। ১৩ মে মরিচঝাঁপিতে নরক ভেঙে পড়লো। গভীর রাত থেকে সেখানে শুরু হলো বর্বর এক নৃশংসতা। টানা তিনদিন চললো আক্রমণ। নৌকা করে লোক যখন পালাচ্ছে তখন তার ওপর লঞ্চ তুলে দেওয়া হলো। লাশ গুম করা ও নৌকা ভাঙার জন্য থাকলো আলাদা পুরস্কার নগদ টাকায়। লেলিয়ে দেওয়া হলো পার্টির ক্যাডারদের। গুন্ডারা ঘরে ঘরে আগুন দিল, সামনে যে পড়েছে তার ওপর চললো আঘাত। নারী হলে তাকে হতে হলো ধর্ষিতা। আগুনে পুড়ে ছাই হলো শ'খানেক শিশু। তাদের তুলে আনার সময়টা দেওয়া হলো না মায়েদের। যারা পালাচ্ছিলেন তাদের ওপর গুলি চলছে পুলিশের। দুঃস্বপ্নের একাত্তরই ফিরে এলো মরিচঝাঁপির ওই বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের ওপর। তফাত এরা ধর্মে ও ভাষায় এক।

কয়েকদিন পরেই মরিচঝাঁপিতে শুরু হয়ে যায় অনাহারে মৃত্যুর মিছিল। অনাহারের জ্বালায় অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে। বেশ কিছু উদ্বাস্তু কুমীরমারির দিকে খাদ্য সংগ্রহ করতে গেলে সেখানেই উদ্বাস্তুদের গুলি করে মারা হয়। গুলিতে স্থানীয় মহিলা মেনি মুন্ডার মৃত্যু হয়। অবশেষে ৩১ জানুয়ারি রাজ্য সরকার দেশভাগের বলি অসহায় উদ্বাস্তুদের ওপর গুলি চালিয়ে রক্তস্নান করে। আগেই ১৭ মে হাইকোর্টের আদেশ অগ্রাহ্য করেই খাদ্য পানীয় জল বন্ধ করা হয়। নৌকা ডুবিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছিল। চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত হয়েছিল তারা। সংবাদমাধ্যমের জন্য জারি হয় ১৪৪ ধারা। মরিচঝাঁপি তাদের জন্য অগম্য ও নিষিদ্ধ। এ নিয়ে কিছু লেখা যাবে না, বলাও যাবে না। উদ্বাস্তুদের টিউবওয়েল থেকে শুরু করে ক্ষেত, জমি, মাছের ঘের, নৌকা সব নষ্ট করে ফেলা হয়। বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা পান করে প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করছিলেন তারা, তাতেও বিষ মেশানো হয়। সে বিষে মরলো অসংখ্য শিশু। বাইরে থেকে খাবার আনার জো নেই, রসদ পাওয়ার জো নেই। ৩১ জানুয়ারি কিছু মরিয়া যুবক পাশের কুমিরমারি থেকে খাবার আনতে সাঁতরে ব্যারিকেড ভাঙলো। পুলিশের গুলিতে মরতে হলো তাদের ৩৬ জনকে। মানুষ ততদিনে বাঁচার জন্য ঘাস খেতে শুরু করেছে!

বিপন্ন এই মানবিকতায় উদ্বিগ্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গের যারাই সাহায্যের হাত বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের সে হাত ঠেকিয়ে দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকারি ও দলীয় তরফে। মাদার টেরেসা পর্যন্ত জানালেন, আক্রান্ত মরিচঝাঁপিতে কিছু করতে তিনি অপারগ। সাহায্যপ্রার্থী সুব্রত চ্যাটার্জিকে বললেন, সরি উই কান্ট গো, নাইদার উই ক্যান এক্সপেইন হোয়াই উই কান্ট...। এদিকে অনাহারে মরতে শুরু করেছে মানুষ। যা-তা খেয়ে অসুখে মরছে শিশু ও বৃদ্ধরা। গুলিতে যাদের মারা হচ্ছে, তাদের লাশ নিমেষেই গুম করে ফেলা হচ্ছে। হয় লঞ্চে তুলে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, নয়তো ডাম্প করা হচ্ছে টাইগার প্রজেক্টে। বাঘের আহার জোগাতে।

পরিসংখ্যান বলছে, ২৪ জানুয়ারি থেকে শুরু অবরোধ থেকে ১৩ মে পর্যন্ত অনাহারে ৯৪ জন এবং বিনা চিকিৎসায় ১৭৭ জন শিশু মারা গেছে। ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ২৪ জন, মারা গেছেন ২৩৯ জন। অনাহারে আত্মহত্যা করেছেন ২ জন। আহত ১৫০, নিখোঁজ ১২৮ জন এবং গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেছেন ৫০০ জন। অন্যান্য ভাষ্যে সংখ্যাটা কয়েকগুণ। এদের অনেকেই দণ্ডকারণ্যে আবার ফিরে গেছেন। কেউ বা পালিয়ে কলকাতায় এসে এখন ফুচকা বিক্রি করেন, হকারি করেন। অনেকেই জানেন না তার স্বজনদের কে কোথায় আছে, বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে।

ঠিকানাহীন উদ্বাস্তুদের মৃতদেহগুলো গায়েব করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ জানান এলাকার বাসিন্দারা। এই ঘটনায় নিহতদের পরিবারগুলোর আহত বিকলাঙ্গরা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা আজও জীবিত। সেদিনের সেই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে তারাই আজ গড়ে তুলেছেন মরিচঝাঁপি সংগ্রাম সমিতি। তারা মরিচঝাঁপি গণহত্যার নায়ক তথাকথিত জননেতা জ্যোতি বসুকে কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারবেন না বলে জানান।

এই গণহত্যার এত দশকের পরেও মৃতের সঠিক সংখ্যা নিয়ে আজও দ্বিমত দেখা যায়। কমিউনিস্ট সরকার পুলিশের গুলিতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করলেও, ঘটনার শিকার এবং স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী ও বিভিন্ন তথ্যসূত্র এই সংখ্যা ৫০০ থেকে ১০০০ ছিল বলে এখনও দাবি করে।

এ যেন নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে পিটিয়ে মেরে ফেলা। সর্বহারার মহান নেতা জ্যোতি বসু সর্বহারাদের আহ্বান করে ডেকে এনেছিলেন মরিচঝাঁপিতে। সেই তিনিই ওই অঞ্চলের উন্নয়ন করতে অস্বীকার করলেন। শুধু তাই নয়, তার নির্দেশেই হলো গণধর্ষণ-গণহত্যা। সেদিন কিন্তু মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে বাঁচার অধিকার চায়নি। তারা নিজেরাই নিজেদের বাঁচার অধিকার তৈরি করে নিয়েছিলেন। তৈরি করেছিলেন চাষের জমি, করেছিলেন পানীয় জলের ব্যবস্থা, এমনকী তারা গড়ে তুলেছিলেন স্কুলও। তবুও এক সংস্কৃতি, এক ভাষার মানুষ হয়েও তাদের ঠাঁই হয়নি এই পশ্চিমবঙ্গে। যদিও আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সুন্দরবন জেলার বারুইপুরের কাছে মুসলমান রোহিঙ্গাদের কলোনি গড়ে তুলেছেন। তবে কি সেদিন 'হিন্দু' বলেই ঠাঁই হয়নি বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের? সেদিন জ্যোতি বসুর আদরের তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সদর্পে বলেছিলেন, 'মরিচঝাঁপি সম্পূর্ণ উদ্বাস্তুশূন্য'। নিউটনের তৃতীয় সূত্র মেনে ৩৪ বছর পর এই বুদ্ধবাবুদেরই সরকারে শূন্য করে দিয়েছেন ওই উদ্বাস্তুরাই। তাই হত্যাই হোক বা গণহত্যাই হোক, এই ইহজগতে পাপ কখনো বাপকেও ছাড়ে না।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের পঞ্চাশ বছর

বামেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস পাপের ঘড়া পূর্ণ করল

সুজিত রায়

ছবি : ১

বিধানসভার সবুজ লনের ফুলের জলসায় পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস ও সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ। তাঁদের মধ্যমণি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। বিখ্যাত আইনজীবী। ততোধিক কুখ্যাত বার বার ভোটে দাঁড়িয়ে গোহারান হারের জন্য। এবার তিনি জিতেছেন। রাজ্যসভায়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কংগ্রেসের সমর্থনে বামপন্থী প্রার্থী হিসেবে। এবং কোনও এক অজ্ঞাত রহস্যে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থী দীনেশ বাজাজের প্রার্থীপদ আচমকা বাতিল হয়ে যাওয়ায়।

ছবি : ২

ফেসবুক আর হোয়াটস্‌অ্যাপের দেওয়াল জুড়ে আর একটা ছবি। বিজয় সাঁই দাঁড়িয়ে আছে বর্ধমানের পোড়ো একটা বাড়ির সামনে। যে বাড়িতে একসঙ্গে খুন হয়েছিলেন তাঁর তিন ভাই ও এক গৃহশিক্ষক। মৃত সন্তানদের রক্তমাখা ভাত খেতে বাধ্য হয়েছিলেন বিজয় সাঁইয়ের মা মৃগনয়না দেবী। বিজয় সাঁই সেই অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

দুটো ছবিকে কি মেলানো যায়? কোনও অবকাশ আছে? উত্তর পেতে হলে ফিরে যেতে হবে ৫০ বছর পিছনে ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক কালো দিন।

তখন রাজ্য প্রশাসনে আসীন যুক্তফ্রন্ট। মুখ্যমন্ত্রী বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জি। কিন্তু শক্তিশালী প্রধান শরিক জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন সিপিআইএম। জ্যোতি বসুই উপমুখ্যমন্ত্রী। তারই ডান হাত হরেকৃষ্ণ কোনার, হরেকৃষ্ণের ভাই বিনয়কৃষ্ণ কোনার, জনৈক খোকন সেন (পরে জানা যায় তিনিই

হলেন পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার তরুণ সদস্য নিরুপম সেন), অমল হালদার, সুবোধ চৌধুরী, সুশীল ভট্টাচার্য, রামনারায়ণ গোস্বামী, আবদুল রশিদ, অশ্বিনী হাজরা, অনিল বসুর প্রত্যক্ষ মদতে সাত সকালে অন্তত হাজার পাঁচেক লাল পতাকাধারী মারমুখী বামকর্মী ঘিরে ধরল প্রতাপেশ্বর শিবতলা লেনের কংগ্রেসি পরিবার সাঁইবাড়ি। তখন ওই যৌথ পরিবারে চলছে সকালের খাওয়া দাওয়া। ভাই নবকুমার সাঁই, মলয় সাঁই, প্রণব সাঁই, বিজয় সাঁই ছাড়াও উপস্থিত নবকুমারের স্ত্রী রেখারানি সাঁই, গৃহকর্ত্রী মৃগনয়না দেবী, তাঁর বোন স্বর্ণলতা দাশ ও স্বর্ণলতার স্বামী অমলাকান্ত দাস এবং তাঁদের ছ'মাস বয়সের সন্তান অমৃত। আলোচনা চলছিল অমৃতর অন্নপ্রাশন নিয়ে। আচমকাই বাড়ির একাংশে উড়ে এল অগ্নিমুখী তির। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বাড়ি। পালাতে গিয়ে প্রথম ভোজালির কোপ পড়লে প্রণবের পিঠে। নবকুমারকে ওই আগুনঘেরা ঘরেই চোখ খুবলে কুপিয়ে কুপিয়ে টুকরো করে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়। পাশের ঘরে গৃহশিক্ষক জিতেন গুণ পড়াচ্ছিলেন নবকুমারের মেয়েকে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্র জিতেনবাবু। তিনিও রেহাই পাননি। কুপিয়ে খুন করা হয় তাঁকে।

বিজয় ও মলয় কোনোরকমে পালায়। মলয় আশ্রয় নেয় পাশের বাড়িতে। সেখান থেকে কোনোভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে কোপানো হয় ধারালো অস্ত্রে। ছ' মাস বয়সের অমৃতকে ছুঁড়ে ফেলা হয় আগুনে। যদিও পরিবারের অন্য সদস্যরা কোনও ভাবে তাকে উদ্ধার করে। এরপর শুরু হয় বাড়ির মহিলাদের ওপর নির্যাতন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, মা মৃগনয়না দেবীকে থালাভর্তি ভাত মেখে দেওয়া হয় মৃতপুত্রদের রক্তে এবং তাঁকে জোর করে তা খাওয়ানো হয়। তারপর সেই খুনি বাহিনী রক্তে ভেজা শরীর নিয়ে বর্ধমান শহর পরিক্রমা করে বীরত্ব প্রদর্শন করতে। হয়তো এটাই বোঝাতে— এভাবেই তাঁরা টিকে থাকবেন প্রশাসনে কোনো একদিন যা টানা ৩৪ বছরের বামজমানার বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করবে।

কিন্তু কেন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড?

কারণ নবকুমার সাঁই ছিলেন কংগ্রেসি। তাঁর আরও অপরাধ, তিনি জোতদার পরিবারের সন্তান। অন্য ভাইরাও ছিলেন কংগ্রেসি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৬৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সাঁই পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল সিপিআইএমকে সমর্থনের জন্য। ১৯৬৯-এ পুনরায় ক্ষমতায় এসে সেই একই চাপ সৃষ্টি করে। তাদের জমি জায়গা দখল করা হয়। কিন্তু সাঁই পরিবার চাপের কাছে মাথা নত করেনি।

অপরাধ এটাই। তাই সাঁইবাড়ি সপরিবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল সিপিএমের একদিনের তাণ্ডবলীলায়। গোটা দেশ কেঁপে উঠেছিল সিপিএমের নৃশংস রূপ দেখে। মামলা হয়েছিল। জেল হয়েছিল অনেকের। এমনকী বিনয়কৃষ্ণ কোনারেরও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। জ্যোতিবাবু সমস্ত মামলা তুলে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ তখন নাকি মানুষ বদলে গেছে (সবাই নাকি বামপন্থী হয়ে গেছে)। মামলা থাকলে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। ১৯৭৩-এ কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলেও কিছু হয়নি। রাজনৈতিক প্রচারের সুবিধা নেওয়া ছাড়া। আজও প্রতাপেশ্বর শিবতলা লেনের অর্ধদগ্ধ সাঁইবাড়ি পোড়োবাড়ি অথবা ভুতুড়ে বাড়ি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে সেই রক্তে পিচ্ছিল রাজনীতির ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সিপিআইএমের কমরেডদের এহেন আক্রমণের একমাত্র নজির যদি এটা হতো, তাহলে বিশেষ বলার কিছু ছিল না। কিন্তু তার পরেও সিপিআইএম কমরেডরা রক্তের স্বাদ ভুলতে পারেনি। সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘের মতোই কংগ্রেসকে শেষ করে দিতে সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দ্বিধা করেননি কমরেড বাহিনী।

১৯৯৩-এর ২১ জুলাই। নো এপিক কার্ড নো ভোট— এই ইস্যুতে যুব কংগ্রেসের ডাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে বামফ্রন্টের পুলিশের গুলিবর্ষণে ১৩ জন যুবকের মৃত্যু হয়। এরা সকলেই ছিলেন সক্রিয় যুব কংগ্রেস কর্মী। ২০০০ সালের ১১ জুলাই নানুর গণহত্যা। ১১ জন ভূমিহীন কৃষককে গুলি করে মারে বামপন্থী ঘাতকরা। ভূমিহীন কৃষক আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস। বামপন্থী অপশাসন, ভোট রিগিং, জাল ভোটারের তালিকা-সহ হাজারো অপবাদের বিরুদ্ধে যখনই মুখ খুলেছে কংগ্রেস, তখনই নির্বিচারে নেমে এসেছে আক্রমণ।

এমনকী কংগ্রেসের নেতারা যখন বামপন্থীদের দেওয়া নোটের তাড়া পকেটে গুঁজে দলটাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে, তখন আক্রমণ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর। ৭ জানুয়ারি ২০১১ সালে নেতাই গ্রামে খুন করা হলো ১১ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে। তারও আগে ২০০১-এর ৪ জানুয়ারি ছোটো আঙ্গারিয়াতে পুড়িয়ে মারা হলো ১১ জন তৃণমূল কর্মীকে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৭-তে রাধামোহনপুরে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায় সিপিআইএমের কমরেডরা। ৫ জন মারা যান। আহত হন ৩০০ জন গ্রামবাসী। ১৪ মার্চ ২০০৭-তে নন্দীগ্রামে কমরেডদের আক্রমণে খুন হলেন ১৪ জন গ্রামবাসী। ঘটেছে কেশপুর, পাঁশকুড়া, রায়নার মতো গণহত্যা, যে গণহত্যায় কমরেডরা হাত পাকিয়েছিলেন মরিচঝাঁপি গণহত্যার ঘটনায়। সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড ছিল সেই ঘাতক সিপিআইএমের হত্যালীলা সিরিজের একটি জঘন্যতম উদাহরণ মাত্র যেখানে মাকে বাধ্য করা হয়েছিল ছেলের রক্ত খেতে আর যেখানে আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল ৬ মাসের শিশুকে।

এবার পাঠকবর্গ, ছবিটা মেলান। এই ঘটনাগুলির সঙ্গে সদ্য প্রকাশিত ওই ছবিটিকে যেখানে কংগ্রেসের সমর্থনে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হচ্ছেন সিপিআইএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। যেখানে ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়ে গেছে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও জোট বেঁধেই লড়বে কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলি।

কোন মুখে জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন কংগ্রেস নেতারা? তাঁরা সম্ভবত ভুলে গেছেন, রাজনীতি মানে একটা কৌশল। ডুবন্ত মানুষের মতো ভেসে যাওয়া কাঠকুটো আঁকড়ে টিকে থাকার লড়াই। তাঁরা হয়তো ভুলেই গেছেন, রাজনীতি কখনও মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। কারণ রাজনীতির মূল উপাদানই মানুষ।

কংগ্রেস নেতাদের আজ যদি প্রশ্ন করা হয়— দাউ দাউ করে জ্বলে যাওয়া সাঁইবাড়ির দৃশ্যটা ভুলে গেছেন? ভুলে গেছেন, মৃগনয়না দেবীর মুখে একদল কমরেড জোর করে গুঁজে দিচ্ছে তিন সন্তানের রক্তমাখা ভাত? আগুনের লেলিহান শিখায় দগ্ধ হচ্ছে ৬ মাসের শিশু? মহাকরণের অনতিদূরেই ধর্মতলা অঞ্চলে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে ১৩টি লাশ? সব ভুলে গেছেন? কীভাবে ভুলতে পারেন?

বামপন্থীদের বলার কিছু নেই। নিজেদের পাপে নিজেরা শেষ হয়ে গেছে। এখন আদর্শ মতানৈক্য সব জলাঞ্জলি দিয়ে দুই দলই হাত ধরাধরি করে পা বাড়িয়েছেন শেষের সে দিনের পথে। ভাবছেন, ফিরে আসবেন বামপন্থাকে অনুসরণ করে? বলছেন, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু হয় না?

তাহলে অধীরবাবু, মান্নানবাবুদের বলি, এক সময়ে আপনারা ডুবেছিলেন আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগে। আজ ভুগছেন, সঙ্গী বাছইয়ে চরম ভুল করে। শত্রু শত্রুই থাকে। তাকে মিত্র করার আগে ভেবে নিতে হয়, ছোরাটা সে পিছনে লুকিয়ে রেখেছে। প্রয়োজন হলেই আঘাত হানবে যে কোনো সময়। যে কোনও মুহূর্তে। ইতিহাস কখনোও মোছে না। তাই ইতিহাসকে যারা ভুলে যায় ইতিহাস তাদের ওপর ঘৃণাবর্ষণ করে প্রতিশোধ নেয়।

কংগ্রেস আজ ইতিহাস ভুলে যাওয়ার পাপে বিদ্ধ, অভিশপ্ত। এই পাপের পারানি গুনতে অনেক কড়ি হারাতে হবে কংগ্রেসকে। হয়তো একদিন কংগ্রেস পুরোপুরি মুছে যাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই। হয়তো বা ভারতবর্ষ থেকেই। সেদিন আগত প্রায়।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

নেতাজীর আদর্শ পালন করাই যথার্থ স্মরণ

ভারতবর্ষের মাটিতে রাষ্ট্রনায়কের অভাব হয়নি কখনো। মাতৃভূমির জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন ভারতমায়ের বহু বীর পুত্র। ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম যতবার আসবে, রাতের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র সমান বাঙ্গলার গর্ব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস উদ্ভাসিত হবেন আমাদের মধ্যে। প্রতিটি বাঙ্গালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবিত আছেন নেতাজী সুভাষ। যার দ্বারা স্বাধীন ভারতের শঙ্খধ্বনি ধ্বনিত হয়েছিল সারা বিশ্বে, তিনিই হারিয়ে গেলেন কালের অন্ধকারে। কিছু সংখ্যক স্বার্থলোভী রাজনৈতিক মানুষের চক্রান্তের শিকার হতে হলো তাঁকে, ছেলের আর ফেরা হলো না। নেতাজী যদি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহলে আজ ভারতের রূপরেখা অন্যরকম হতো।

আজ স্বাধীনতার ৭৪ বছর পরেও আমাদের তার মাশুল দিতে হচ্ছে। নেতাজীর দেশপ্রেম সেদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁকে রুখে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেছিল। সমগ্র দেশের মানুষকে তিনি এক সূত্রে বেঁধেছিলেন—'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' তাঁর এই উক্তি বিপুল ভাবে সাড়া জাগিয়েছিল দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাঁর এক ডাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। আজও আমরা স্মরণে রেখেছি তাঁকে, ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর ছবিতে মালা-ফুল দিয়ে আমরা তাঁকে সম্মান জানাই।

কিন্তু সঠিক অর্থে কী তাঁকে সম্মান জানাতে পেরেছি আমরা? যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন প্রতিটি ভারতবাসী একসূত্রে সংগঠিত হবে। আমাদের উচিত সেই ত্যাগকে মনে রাখা, যার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যা আমরা পেয়েছি তার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু সঠিক অর্থে তাঁর সম্মান তখনই করতে পারবো যখন তাঁর উপলব্ধি অনুভব করতে পারবো এবং দেশপ্রেম নিজের মধ্যে জাগ্রত করতে পারবো। তাই শুধু ফুল, মালা দিয়ে নয়, প্রকৃত অর্থে বরণ করতে হবে তাঁর আদর্শকে। জন্মদাত্রী মায়ের ঋণ যেমন শোধ করা যায় না সেরকমই নেতাজী তথা ভারতমায়ের বহু বীর শহিদদের কাছে আমরা চির ঋণী। তা শোধ করা সম্ভব না হলেও যেটা আমরা তাঁদের থেকে পেয়েছি সেটা বজায় রাখা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব।

—পিয়ালী ব্যানার্জি,
ওলাবিবিতলা লেন, হাওড়া।

রাম মন্দির থেকে রাষ্ট্রমন্দির

রামায়ণ অর্থাৎ রামের অয়ন। শ্রীরামের এই অয়ন বা যাত্রা ছিল নিজের কর্তব্যবোধের পথে অবিচল থাকার এক অবিস্মরণীয় জীবনযাত্রা। শ্রীরামচন্দ্রের এই যাত্রা ছিল, সমগ্র ভারতবর্ষকে একসূত্রে গাঁথতে গৃহসুখ ছেড়ে এক ত্যাগীর যাত্রা।

ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে ঠিক, একই রকমের ভারত ভ্রমণ আমরা দেখতে পাই আদি শঙ্করাচার্যের। একের পর এক বৈদেশিক শাসকের যাঁতাকলে যখন সনাতন সংস্কৃতির নাভিশ্বাস তখন কৃষ্ণ নাম-সংকীর্তনের এক অভিনব উপায় বের করে ভারতবর্ষের এক প্রান্তে ভ্রমণ করলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

ঔপনিবেশিক শক্তির আস্ফালনে ভারতবর্ষের স্বাভিমান যখন স্তিমিত, ঠিক তখনই আপন সংস্কৃতির প্রতি ভারতবাসীকে আত্মবিশ্বাসী করতে বেদান্ত দর্শনের সার নিয়ে ভারত ভ্রমণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ না থেকে বিদেশ যাত্রা করলেন এবং একদা বিশ্বব্যাপৃত সনাতন সংস্কৃতির মাহাত্ম্য বিশ্বের দরবারে তুলে ধরলেন। তারপর, আবার একবার কৃষ্ণপ্রেম ভারত-সহ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে বিশ্ব-ভ্রমণ করলেন যাটোর্ধ্ব শ্রীল প্রভুপাদ। সনাতন ঐতিহ্যকে স্বমহিমায় জাগ্রত করতে শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে উপেক্ষা করে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শত শত ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীর অয়ন অব্যাহত।

শ্রীরামচন্দ্রের যাত্রার বিবরণ রামায়ণ তাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্য নির্মাণের পন্থার নির্দেশ দেয়। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রই রাষ্ট্রীয় ঐক্য নির্মাণে ভ্রমণের মাধ্যমে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের অব্যর্থ পদ্ধতির পথপ্রদর্শক। শ্রীরামচন্দ্রের দেখানো পথেই বারবার সনাতন সংস্কৃতি প্রয়োজনীয় প্রাণবায়ু পেয়েছে।

শ্রীরামচন্দ্র তাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতীক। রাম-ভক্তি ভারতবর্ষ-সহ সমগ্র পৃথিবীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যেও যে আপন গতিতে প্রবহমান তার প্রমাণ অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় ধ্রুবক অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয়, অক্ষয়। এইরকম অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, অদ্বিতীয় রামনাম যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্য-সূত্র, তা স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির, তাই রাষ্ট্র মন্দির।

—পিন্টু সান্যাল,
ইংরেজবাজার, মালদহ।

স্বর্গীয় শ্রীগজানন বাপট : কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

স্বস্তিকায় গজাননদার লোকান্তরিত হওয়ার সংবাদে আমি মর্মাহত। সেইসঙ্গে মনে পড়ে গেল পুরানো দিনের কিছু কথা। ১৯৭৫ সালে এপ্রিল মাসে আমি স্টেট ব্যাঙ্কের চাকরিতে আরামবাগ যাই। সঙ্ঘ নিবাসে থাকতাম। মহকুমা প্রচারক বিজয়

আঢ্যও থাকতেন। একদিন ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ি। সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি শুরু হলো। প্রায় সাড়ে ন'টার সময়ে দরজায় আঘাতে তন্দ্রা ভাঙল। খুলে দেখি গজাননদা। বললেন খাওয়া দাওয়া হয়েছে? বললাম, না। শুয়ে পড়েছিলাম। যা বৃষ্টি হচ্ছে। গজাননদা বললেন, চাল, ডাল, আলু আছে তো? বললাম, তা আছে। গজাননদা উদ্যোগী হয়ে স্টোভে রান্না বসালেন। ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ খাওয়া হলো। তিনি বললেন, আছো নিবাসে, না খেয়ে থাকবে?

জুন মাসে জরুরি অবস্থা জারি হলো। পুলিশ এসে নিবাস সিল করে দিল। আমি সহকর্মীদের মেসে থাকলাম। একদিন গজাননদা এলেন। স্নান-বিশ্রাম করলেন ও কিছুক্ষণ বাদে চলে গেলেন। মেসের কয়েকজন সহকর্মী এলেন জানতে, ইনি কে? বললাম সঙ্ঘ প্রচারক ছিলেন, গজানন বিনায়ক বাপট। তারা বললেন এরকম নামের ব্যক্তির সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? এখানে যেন না আসেন। ওরা বললেন, এরকম লোককে আসতে বরণ করবেন। কারণ এখন তে সঙ্ঘ বেআইনি হয়েছে। আমরা ঝামেলায় পড়ে যাব। একজন স্বয়ংসেবকের মাধ্যমে গজননদাকে খবর পাঠালাম, যে আপাতত এই স্থান এড়িয়ে যাবেন। এই ছিলেন গজাননদা। তার আশীর্বাদ আমার চলার পথের পাথেয়। তার স্মৃতির প্রতি প্রণত হই।

—**ভোলানাথ নন্দী,**
মানিকপুর, মেদিনীপুর।

হিন্দুদের গভীর ভাবে ভাবতে হবে

পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির আকাশে আবার কালোমেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। মুসলিম লিগ আর শক্তি সঞ্চয় করছে, শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। নেতৃত্বে রয়েছে ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি। সহযোগী হিসেবে রয়েছে হায়দরাবাদের কুখ্যাত অল ইন্ডিয়া মুসলিম ইত্তেহাদুল মুসলমিনের আসাদুদ্দিন ওআইসি। ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন চার পাঁচ হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীর নাম পশ্চিমবঙ্গে ভোটার লিস্টে উঠে গেছে। নিশিতভাবে বলা যায় এইসব অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা ভোটররা অবশ্যই মুসলমান সংগঠনকেই ভোট দেবে। তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও লাভ হবে না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গবাসীরা সম্ভবত ১৯৪৬ সালের গ্রেট ক্যালকটা কিলিংসের বিভৎস দিনগুলির কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে। ১৯৪৬ সালের ১৬,১৭ ও ১৮ আগস্ট ৩ দিনে আনুমানিক ১৬ হাজার মানুষ হত্যা করা হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে সেন্সাস সম্ভব ছিল না। বর্তমান প্রজন্ম সম্ভবত এই বীভৎস দিনগুলির কথা কিছু জানেই না। অর্থাৎ তাদের জানানো হয়নি। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের ২ মাস পরেই ঘটেছিল নোয়াখালি জেনোসাইড। ৬ থেকে ৬০ বছরের কোনও হিন্দু কন্যা বা রমণী রেহাই পায়নি মুসলমান দুষ্কৃতীদের নশংস অত্যাচারের হাত থেকে। মৃতের সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভবপর ছিল না সম্ভবত। এছাড়া বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা, হিন্দু কন্যা অপহরণ, ধর্ষণ, এবং ধর্মান্তরকরণ আকছার ঘটেই চলেছে। হিন্দু সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি বা শ্মশান ঘাট দখল করা কোনও ঘটনাই নয়। পশ্চিমবঙ্গ যদি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তাহলে পশ্চিমবঙ্গেও ওই ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে আর দেশের রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমান ভোটের লালসায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলবে না। ফলে উৎসাহিত হয়ে উঠবে মুসলমানরা। তাদের অত্যাচারের ঘটনা দিনকে দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বর্তমানে দেগঙ্গা, ধুলাগড়, উস্থি, নলিয়াখালি, বাদুড়িয়া, বসিরহাট, কালিয়াচক প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুরা যেভাবে মুসলমান দুষ্কৃতীদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে অত্যাচারিত হচ্ছে হিন্দুদের দোকান লুট হচ্ছে, বাড়িঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে, হিন্দু মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে, হিন্দু কন্যাগণ অপহৃতা হচ্ছে, ধর্ষিতা হচ্ছে, ধর্মান্তরিতা হতে বাধ্য হচ্ছে। ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির নয়া দল 'ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট' সবে অঙ্কুরিত হয়েছে। এটা যেদিন মহীরুহে পরিণত হবে সেদিন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা হবে ১৯৪৬ সালের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস ও নোয়াখালি জেনোসাইডের ঘটনাবলীর মতো অনুরূপ ঘটনা। কারণ পবিত্র কোরাণের প্রধান বক্তব্যই হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীটা হচ্ছে আল্লাহর সাম্রাজ্য। এখানে সর্বত্র আল্লাহর শাসন ব্যবস্থা 'শরিয়তি' চালু করতে হবে ও সবাইকে ইসলাম কবুল করতে হবে। যে ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করবে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এই বিষয়টি হিন্দুদের গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

রামনাম শুনে মমতার গোঁসা

২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রধানমন্ত্রীকে দেখে শ্রোতাদের একাংশ 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেয়। রামনাম শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন মমতা। স্বভাবসিদ্ধ স্টাইলে বলেন, 'আমাকে অপমান করা হয়েছে। আমি কিছু বলব না।' প্রশ্ন হলো, মমতা কেন এমন করলেন? কিছুদিন আগেই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে তাঁর গাড়ি থেকে নেমে তেড়ে যাওয়া এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এবং কার্যত মমতা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাহলে, নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় তিনি কেন একই কাণ্ড বাধালেন? মমতার বোঝা উচিত এটা পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ নয়। এখানে জয় শ্রীরাম কোনও নিষিদ্ধ ধ্বনি নয়। স্বাভাবিক ভাবেই বহু মানুষ মমতার এই আচরণের প্রতিবাদ করেছেন। এবং আবারো পিছু হঠতে বাধ্য করছেন তাঁকে।

—**দেবাশিস রক্ষিত,**
কলকাতা-৭।

প্রাচীন এক শিল্পকর্মের পুনরুজ্জীবন

সুতপা বসাক ভড়

তাঁর নাম যোধাইয়া বাঈ বৈগা। বয়স আশি পেরিয়েছে, উমরিয়া জেলার ছোট্ট গ্রাম লোড়ায় থাকেন। তাঁর পরিচয় অতি সামান্য হলেও কাজের খ্যাতি আকাশের উচ্চতাকেও হার মানিয়েছে। ছোটোখাটো অতি সাধারণ জীবনপঞ্জী যাঁর, সেই বনবাসী মহিলা যোধাইয়া বাঈ-এর চিত্রকলার প্রদর্শনী ইতালি, আমেরিকা, জার্মানির মতো দেশে চলেছে।

আশিটির বেশি বসন্ত দেখেছেন যোধাইয়া বাঈ। জীবনের এই পড়ন্তবেলার বেশিরভাগ মানুষের নতুন করে কিছু করার ইচ্ছা যখন সীমিত হয়ে যায়, তখন তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে নিজের এবং নিজের দেশের কলাচিত্রের পরিচয় বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। ইতালির মিলান শহরে আয়োজিত তাঁর চিত্রকলা প্রদর্শনীর জন্য তিনি নিজে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেননি, বরং তাঁর কলাকৃতি দেখে প্রভাবিত হয়ে শিল্পপ্রেমীরা তাঁকে ওই স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। স্থানীয় কলাপ্রেমী আশিস স্বামী যোধাইয়া বাঈয়ের এই চিত্রগুলি দেখেন। তিনি ভোপালের কোনো ট্রাইবাল আর্টের জ্ঞানী বিশেষজ্ঞ শ্রীবাস্তবকে এই ব্যাপারে জানান। তাঁরা সবাই ওই বিশেষ চিত্রকলাগুলি দেখে এতবেশি প্রভাবিত হন যে, এই চিত্রগুলিকে অন্তঃরাষ্ট্রীয় মঞ্চে পৌঁছে দেবার জন্য মনস্থির করেন। ইতালির গৈলেরিয়া ফ্রান্সিসকো জানুমো সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরাও যোধাইয়া বাঈয়ের চিত্রকলাগুলি দেখে অভিভূত হন এবং এগুলিকে ইতালিতে প্রদর্শিত করার জন্য মনস্থির করেন। এইভাবে যোধাইয়া বাঈয়ের কলাকৃতি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ইতালি পৌঁছে যায়।

যোধাইয়া বাঈ আধুনিক পৃথিবীর সামনে ভারতবর্ষের বনবাসী সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। সেই সহজ, সাবলীল চিত্রকলা তাঁকে এবং বনবাসী সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আশি বছরেরও বেশি বয়স্কা এই মহিলা গত প্রায় পনেরো বছর ধরে বনবাসী কলাক্ষেত্রে ইতিহাস রচনা করে চলেছেন।

যোধাইয়া বাঈয়ের জীবন খুব সংঘর্ষময়। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে স্বামীহারা হন। মজদুরি করে সন্তানদের লালনপালন করেছেন। হিংস্র জানোয়ারে ভরা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনেছেন। কোনোদিন বিদ্যালয়ে না যাওয়া যোধাইয়া বাঈয়ের মতো বনবাসী মহিলার এছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না।

ইতালির মিলান শহরের আর্টগ্যালারিতে যোধাইয়া বাঈয়ের চিত্রপ্রদর্শনীর শুভারম্ভের জন্য বিশেষ নকশা করা নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ করা হয়েছিল। এই নিমন্ত্রণপত্রে তাঁর হাতে আঁকা ভগবান শিবের প্রতিকৃতি বানানো ছিল এবং এর নীচে ছিল তাঁর নিজস্ব চিহ্ন বা প্রতীক।

যোধাইয়া বাঈ বিলুপ্তপ্রায় বৈগিন চিত্রকলাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। যে বড়োদেবতা ও বঘাসুরের চিত্র দ্বারা বৈগাওদের বাড়ির দেওয়ালগুলি অতীতে বিচিত্র হতো, সেগুলি এখন আর দেখা যায় না। নতুন প্রজন্মও এই ব্যাপারে জানে না। ওইসব পারম্পরিক চিত্রগুলি যখন যোধাইয়া বাঈ ক্যানভাস ও কাগজে আধুনিক রঙের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখন বৈগা জনজাতির এই বিশেষ কলাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা তাঁকে সম্মানিত করেছে। মধ্যপ্রদেশ জনজাতীয় সংগ্রহালয় ভোপালে যোধাইয়া বাঈয়ের নামে একটি স্থায়ী দেওয়াল সংরক্ষিত আছে, সেখানে কেবলমাত্র তাঁর বানানো চিত্রকলা প্রদর্শিত হয়। মানস সংগ্রহালয়ের তাঁর চিত্র রাখা আছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানও তাঁকে সম্মানিত করেছেন। এছাড়া সুদূর আমেরিকা ও জার্মানিতেও তাঁর অঙ্কিত চিত্রকলা পৌঁছে গেছে।

যোধাইয়া বাঈ তাঁদের সমাজের অন্যান্য মহিলার মতো নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর ভেতরের জাগ্রত শিল্পীসত্তা তাঁকে প্রাচীন সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে যুগানুকূল করে তোলার কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে। সেজন্য আমাদের দেশের একটি অন্যতম সুন্দর চিত্রকলা তাঁর হাতে পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে। এরকম একজন উদ্যোগী চিত্রশিল্পীর কাছে দেশ চিরঋণী হয়ে থাকবে। চিত্রশিল্পী যোধাইয়া বাঈকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম! ▌

গাঁটে ব্যথা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথী মল্লিক

আমাদের শরীরে চলতি নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে বিপাকীয় ক্রিয়া বা মেটাবলিজম বলে। মেটাবলিজমের জন্য আমাদের গ্রহণ করা খাবার ভেঙে যায় এবং খাবারের প্রয়োজনীয় অংশটুকু শরীর গ্রহণ করে। শরীরের রেচন অঙ্গগুলি রেচন কার্যের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় জিনিস শরীর থেকে বের করে দেয়। রেচনকার্য আমাদের শরীরে চলা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, কেননা, এই কাজ ঠিকমতো না হলে শরীরে দূষিত পদার্থ জমা হয়ে নানা রোগ হয়।

আমাদের শরীরে মেটাবলিজমের ফলে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থগুলি হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ। অন্যদিকে, লবণ ও প্রোটিনের বিপাক ক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্যপদার্থ যেমন অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফুসফুসের মাধ্যমে প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এদিকে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্যপদার্থ এক প্রণালীবদ্ধ প্রক্রিয়ায় কিডনি, ত্বক ইত্যাদি অঙ্গের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় অসংগতি ঘটলে রোগ সৃষ্টি হয়। মানুষের শরীরে ইউরিক অ্যাসিড জমা হয়ে সৃষ্ট এক ধরনের রোগ আর্থ্রাইটিস বা গ্রন্থির ব্যথা। প্রোটিন যেহেতু আমাদের খাদ্যের এক প্রধান উপাদান, তাই প্রোটিনের বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে আমাদের শরীরে স্বাভাবিকভাবেই ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। তবে রেচনকার্যের ফলে বৃক্কের মাধ্যমে এটি শরীর থেকে বের হয়ে যায়। চিকিৎসা- বিজ্ঞানীদের মতে ৩.৪-৭.০০ এম জি/ডি এল এর চেয়ে বেশি মাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড হলেই মানুষের শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়লে রক্তে ইউরেট হাত-পায়ের গাঁটের ভেতর দানা বাঁধতে শুরু করে। আর তখনই শরীরের গাঁটগুলি লাল হয়ে ফুলে ওঠে ও প্রচণ্ড ব্যথা হয়। এই রোগ ছাড়াও ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি হলে মূত্রনালী ও কিডনিতে পাথর সৃষ্টি হয়। গবেষণায় জানা গেছে, যে সমস্ত খাদ্যে পিউরিন থাকে সেই পিউরিন ভেঙে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়ে রক্তে জমা হয়। সব ধরনের মাংসে পিউরিন থাকলেও বিশেষত পাঁঠার মাংস, লিভার ও শুয়োরের মাংস ইত্যাদিতে বেশি পরিমাণে পিউরিন থাকে। এ ছাড়া ফুলকপি, মুসুর ডাল, পালং শাক, রেড ওয়াইন খেলেও শরীরে ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডযুক্ত খাদ্যবস্তুর প্রভাবের পাশাপাশি শরীরে বিপাকীয় ক্রিয়ার অসংগতি হলেও শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুখাদ্য অর্থাৎ পরিমিত খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি নিয়মিত পরিশ্রমই হচ্ছে মানুষের সুস্বাস্থ্যের আধার। শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে অখাদ্য বর্জন-সহ নিয়মিত পরিশ্রমে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমাদের গ্রহণ করা খাদ্যের প্রোটিনে যাতে মাংসের চেয়ে মাছের প্রোটিন বেশি থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এছাড়া শরীরের রেচনক্রিয়া যাতে ঠিকঠাক থাকে তাই পর্যাপ্ত জল পান করা উচিত। সবুজ শাকসবজি ছাড়াও দৈনিক খাবারের তালিকায় আঁশযুক্ত খাবার রাখা উচিত। সঙ্গে খাওয়া উচিত মরসুমি ফল। ফলের রস ও আঁশ জাতীয় খাবার শরীরের বর্জ্যপদার্থ বের করতে সাহায্য করে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

লক্ষণভিত্তিক হোমিওপ্যাথি প্রয়োগে এই সমস্যার সমাধান হয়। যে সমস্ত ওষুধগুলি ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায় সেগুলি হলো— রাসটক্স, ক্যালকেরিয়া কার্ব, ন্যাফেলিয়াম, লিথিয়াম কার্ব, অস্টিও অর্থ্রাইটিস নোসাড, ম্যাগ ফস, জ্যাকেরানডা প্রভৃতি। তবে কখনওই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ, চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতায় ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন, তা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(লেখক বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক)

ভাইরাস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় টিকাকরণ

স্বপন দাস

অবশেষে শাপ মুক্তি। দীর্ঘ এক বছর ধরে চলা করোনা নামক একটি ভাইরাসের করাল গ্রাসে ছিন্নভিন্ন সারা পৃথিবী। সঙ্গে আমাদের ভারত। প্রায় ১৩০ কোটি মানুষকে কীভাবে রক্ষা করা যাবে, সেটা নিয়েই চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ কর্মী থেকে প্রশাসন চিন্তায় ছিলেন। শেষে আশীর্বাদ হয়ে এল শাপমুক্তির উপায়। করোনা ভাইরাসকে রোখার টিকা বা ভ্যাক্সিন। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের অর্থাৎ আই সি এম আর-এর কোভ্যাক্সিন এক অসামান্য সাফল্য নিয়ে এল সমগ্র জাতিকে রক্ষার জন্য। সঙ্গে এসেছে অন্য আর একটি ভ্যাক্সিন সেটি অক্সফোর্ড এবং অ্যাক্সজেনেকার কোভিশিল্ড। এই দুটি টিকাই মানব শরীরে প্রয়োগের ট্রায়ালে সাফল্যের পর, সাধারণের দেহে প্রয়োগ করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এই ট্রায়াল আমার-আপনার মতো সাধারণ মানুষ পরীক্ষার জন্য নিজের শরীরে নিয়েছেন, অনেক ভয় ও চিন্তাকে তুচ্ছ করে। এই ট্রায়ালে দেখা গেছে, সেই সব মানুষের

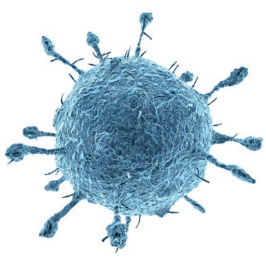

শরীরে কোনোরকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি বা সামান্য দেখা দিলেও সেটিকে দূর করা হয়েছে পরবর্তী ট্রায়ালে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে চিকিৎসকরা বলছেন, কোভিশিল্ড বহন করছে ভাইরাল ভেক্টর ক্যারিয়ার প্রোটিন, যেটি মানব দেহে অ্যাডিনো ভাইরাসকে বাড়তে দেয় না। এই প্রোটিনের শুধু বাইরের অংশ অর্থাৎ একটি খোল তৈরি করে, তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানীরা ঢুকিয়ে দিয়েছেন করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন। যেটি শরীরে গিয়ে নিজে থেকেই লড়াই করে করোনা ভাইরাসের বেড়ে ওঠাকে বা শরীরে ক্ষতি করার সম্ভাবনাকে রোধ করবে। কোভ্যাক্সিন মানে আমাদের

কোভ্যাক্সিন নিরাপদ জানাল ল্যানসেট

বিভিন্ন অসুখের টিকা নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তাদের কাছে ল্যানসেট নামটি বিশেষভাবে পরিচিত। সারা বিশ্বে মান্য এই পত্রিকাটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের আওতায় তৈরি কোভ্যাক্সিনের ফেজ-১ ট্রায়ালের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে টিকাটিকে 'সম্পূর্ণ নিরাপদ' বলে ঘোষণা করেছে। একটি নিবন্ধে লেখা হয়েছে, সব বয়েসের মানুষের কাছেই টিকাটি গ্রহণযোগ্য। কারণ টিকা নেওয়ার পর বড়ো ধরনের কোনও গোলযোগ দেখা দেয়নি।

দেশীয় ভ্যাক্সিনে থাকছে করোনাকে নিষ্ক্রিয় করে দেবার ক্ষমতা। সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবে এই ভ্যাক্সিন।

দুটি ভ্যাক্সিনই আমাদের জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার বা রক্ষা করার দিশা দেখিয়েছে বলে দাবি করছেন সারা রাজ্যের চিকিৎসক মহল। তবে গত ১৬ জানুয়ারির মাহেন্দ্রক্ষণকে বেছে নিয়ে দেশের সরকার সারা দেশে মানুষকে রক্ষা করার এই টিকাকরণ শুরু করেছে। যে হাহাকার, ভয়, আতঙ্ক সারা দেশের মানুষের মনকে ২০২০-র সেই ফেব্রুয়ারির শেষ ভাগ থেকে গ্রাস করে রেখেছে, সেই রাহুগ্রাস থেকে মুক্তিপথের সন্ধান পেয়ে আপামর মানুষ নতুন ভাবে বেঁচে ওঠার স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে। প্রথমে পাচ্ছেন করোনা যোদ্ধারা, তারপরে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ।

তবে কোনো চলার পথই একেবারে মসৃণ হয় না। এক্ষেত্রেও হচ্ছে না। বারে বারে বাধা হয়ে উঠছে, কিছু অজ্ঞ মানুষের বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা। তারা হয়তো কোনো অভিসন্ধি নিয়ে একাজ করছেন, নয়তো বা জেনে বুঝেই মানুষকে একটা দ্বিধার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের বৃহদাংশ। যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা বলে একটা ভয় মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে, সেই প্রসঙ্গে চিকিৎসকদের দৃঢ় মত, কোনো মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এই ভ্যাক্সিন নিলে হয় না। আর সেই সম্ভাবনাও নেই। সেটি বারে বারে মানব শরীরে ট্রায়ালে প্রমাণিত হবার পরই, সাধারণের মানুষকে ভ্যাক্সিন দেবার বিষয়টি অনুমোদিত করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আমাদের দেশের আই সি এম আর।

বর্তমানে কলকাতার উপকণ্ঠে একটি সরকারি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক বি রায় বলেন, 'আমি মনে করি এই ভ্যাক্সিন রক্ষাকবচ হয়ে এসেছে জাতির কাছে। যেসব মানুষ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা বলছেন, তাঁরা এটা জেনে রাখুন সব মেডিসিনেরই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। এই যে সবাই প্যারাসিটামল খান, তাঁর কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই? একটা হজমের সামান্য ওষুধ আমরা মুড়ি মুড়কির মতো চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই খাই, সেটার কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই? ফিরে যাই সেই ছোটোবেলায়, জন্মের সময় থেকে নানা ভ্যাক্সিন আমাদের দেওয়া হয়। সেটা নিয়ে কি কোনোদিন প্রশ্ন তুলেছি আমরা? তাহলে এই ভ্যাক্সিনের জন্য এই ধুয়া তোলা কেন? আসলে হয়েছে কী, সব কিছুর ক্ষেত্রেই প্রথম দিকে অহেতুক একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা কিছু মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সেটাকে মেনে নেওয়া যায় না। আমরা যারা জীবনকে তুচ্ছ করে গত ১১টা মাস লড়াই করে চলেছি, তাঁদের কথা কেউ কি ভাবেন? আমার বেশ কয়েকজন সহকর্মী এই চিকিৎসা করতে করতেই করোনা সংক্রমণে চলে গেলেন, তাঁদের কথা বা তাঁদের আত্মত্যাগের কথা কোথাও কি লেখা থাকবে? না কি কোনোদিন এই শহিদদের কথা আলোচিত হবে কোনো আলোচনা সভায়? নিঃশব্দে তাঁরা করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে চলেই গেলেন চিরতরে। যারা আজকে নানা কথা বলে একটা বাধার সৃষ্টি করছেন, তাঁরা প্রকারন্তরে জাতিকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে চলেছেন।'

টিকাকরণে

করোনার ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে শুয়োরের চর্বি দিয়ে। ইসলামে শুয়োর হারাম। তাই মুসলমানেরা ভ্যাকসিন নেবেন না।

ধর্মের জিগির

এমনটাই দাবি করেছে কয়েকটি ইসলামিক সংগঠন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পোলিও টিকাকরণের সময়েও কয়েকটি ইসলমিক সংগঠন পোলিও টিকার মাধ্যমে সরকার মুসলমানদের নপুংসক করার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছিল। যার জেরে অসংখ্য মুসলমান টিকা নেননি এবং ভারতের মোট পোলিও আক্রান্ত রোগীর মধ্যে মুসলমানরাই ছিলেন সংখ্যায় সর্বাধিক। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে সরকারকে নিখরচায় তাদের চিকিৎসা করতে হয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, ধর্মের জুজু দেখিয়ে মুসলমানেরা যদি পোলিওর মতো করোনার টিকাও না নেন এবং সেই কারণে যদি করোনা মহামারী আবার ফিরে আসে তাহলে তার দায় কে বহন করবে?

একটা ভ্যাক্সিন কীভাবে একটা গোটা জাতিকে রক্ষা করছে একবার দেখা যাক। প্রথমত, এটা আমাদের মারণভয় কাটিয়ে দিয়ে, সেই শক্তিকে জাগ্রত করছে যেটা কয়েক লক্ষ গুণ আমাদের করোনার বিরুদ্ধে শরীরের ভিতর ও বাইরে শক্তিশালী করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের ব্যক্তিগত শারীরিক সুরক্ষাকে মজবুত করতে সাহায্য করছে। তৃতীয়ত, আমাদের সমাজে এই ভ্যাক্সিন একটা কঠোর প্রতিরোধ শক্তি তৈরি করবে, যেটাকে বলা হয় হার্ড ইমিউনিটি তৈরি করে একটা সুরক্ষা আবর্তের সৃষ্টি করবে, যেটা আমাদের সমাজের সিংহভাগের ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়াবে।

জোকা ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক, ডাঃ উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভ্যাক্সিন নিয়ে অহেতুক একটা অন্য রকম ধারণা ছড়ান হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলি, এই যে দুটি ভ্যাক্সিন আমাদের দেওয়া হচ্ছে, সেটি পরীক্ষিত হয়েছে নানা ভাবে। যখন বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসকরা মনে করেছেন নিরাপদ, সেই সময়েই তাঁরা ছাড়পত্র দিয়েছেন ব্যবহারের। মনে রাখবেন, যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলি তো এই ভ্যাক্সিনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হতে পারে। দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটাই প্রমাণিত হবে। আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলি, এই ভ্যাক্সিনের সাইড এফেক্ট হয়েছে সেরকম কোনো খবরও নেই, তাছাড়া কেউ ভ্যাক্সিন নেবার পর মারা গেছেন বা সিভিয়ার অ্যালার্জি হয়েছে, সেটাও কিন্তু এখনও পর্যন্ত জানা নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মনোবল কয়েকশো শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে। যেটা গত এগারো মাসে একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা কী জানেন, আমাদের গোটা সমাজে এই ভ্যাক্সিনের মধ্যে দিয়ে সিংহভাগের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে যাবে। যেটা ভবিষ্যতে আমাদের এই ধরনের ভাইরাসের আতঙ্ক

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন

ভ্যাকসিন নেওয়ার পর খুবই ভালো লাগছে। আমি আমার দেশের জন্য গর্বিত। যেভাবে সরকার ভ্যাকসিন তৈরি করতে উঠে পড়ে লেগেছিল, তা প্রশংসার দাবি রাখে।

—ডাঃ দেবী শেট্টি, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ।

আমি মানুষকে একটি কথাই বলতে চাই, এই কোভিড পরিস্থিতি থেকে বেরনো প্রয়োজন। অর্থনীতির হাল ফেরাতে হবে। সেজন্য সকলকেই টিকা নিতে হবে।

—রণদীপ গুলেরিয়া, এইমস-এর ডিরেক্টর।

আমি কিছু বুঝতেই পারিনি। এমনিতেই টিকা নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলাম। ভালোভাবেই প্রথম ডোজটা নিতে পেরেছি। সকলেরই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত। যাতে দেশ করোনামুক্ত হতে পারে।

—ডাঃ এম এল শর্মা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

বন্ধু ভারত, দরদি ভারত

প্রতিবেশী দেশগুলিতে বিনামূল্যে করোনার টিকা পাঠাচ্ছে ভারত। এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছে আমেরিকা। জানুয়ারির ১৯ তারিখে টিকা পাঠানোর কথা ঘোষণা করে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে পাঠানো। কোন দেশে কত টিকা পাঠাল ভারত, একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

১। ভুটান—১.৫ লক্ষ ডোজ। ২। মালদ্বীপ—১ লক্ষ ডোজ। ৩। নেপাল—১০ লক্ষ ডোজ। ৪। বাংলাদেশ—২০ লক্ষ ডোজ।

এছাড়া সিসিলি, মরিশাস ও মায়ানমারেও ভারত বিনামূল্যে টিকা পাঠিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, শ্রীলংকা ও আফগানিস্তানে শীঘ্রই টিকা পাঠানো শুরু হবে। তবে শুধু বিনামূল্যের টিকা নয়। এখনও পর্যন্ত বিশ্বের ৯২টি দেশ ভারতে তৈরি টিকা কেনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এইসব দেশের মধ্যে সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল এবং মরোক্কোয় টিকা পাঠানো শুরু করেছে ভারত।

ভ্যাকসিন চুরি

প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রথম দফায় শুধু চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকা দেওয়া হবে। জনপ্রতিনিধিদের তিনি প্রথম দফায় টিকা না নিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই টিকা নেওয়ার জন্য ১৬ জানুয়ারি নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন— সুভাষ মণ্ডল— ভাতারের বিধায়ক, বনমালী হাজরা— প্রাক্তন বিধায়ক, জহর বাগদি— জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ (ভাতার), মহেন্দ্র হাজরা— ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য বিভাগের সদস্য, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়— কাটোয়ার বিধায়ক।

থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে।'

আর এক চিকিৎসক, ডাঃ উত্তম মজুমদার, যিনি পেশাগত ভাবে একটি সরকারি হাসপাতলে সুপারের দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন, তিনি জানান, 'যে কোনো অতিমারী বা মহামারীর ক্ষেত্রে ফ্রন্ট লাইন চিকিৎসা হচ্ছে সামগ্রিক ভাবে ভ্যাক্সিনেট করা। এই ভ্যাক্সিনেট করা মানে, আমাদের শরীরে কৃত্রিম ভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেওয়া। এই প্রতিরোধ শক্তি, ওই ভাইরাসটার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে আমাদের শরীরে। যে ভাবে স্মল পক্স বা এইডস-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে। আমাদের দেশে যে ভ্যাক্সিন দুটো টিকাকরণের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে সেটা পৃথিবীর বহু দেশেই দেওয়া হচ্ছে। আর পরীক্ষিত যে, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সেরকম নেই। আমাদের ভারতে যদি নিরাপত্তার দিক দিয়ে দেখা যায়, তাহলে বলব প্রায় সিংহ ভাগ নিরাপদ। আমি দেখেছি, এই ভ্যাক্সিনের কোনোরকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। দেখুন, আপনি যদি ট্রিপল অ্যান্টিজেন বা মামসের ভ্যাক্সিন নেন, সেখানেও দেখবেন সামান্য হলেও সেখানেও একটা অতি ক্ষুদ্র পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকবেই, সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামল খেয়েও তো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস আছে। তাহলে এই ভ্যাক্সিনে যে সামান্যতম থাকবে না, সেটা আশা করাও অন্যায়। এটা নিয়ে ভাবলে তো চলবে না। আমাদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাবতে হবে। কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র শতাংশের জন্য এই ভ্যাক্সিনেশনের থামিয়ে দেওয়ার কথা যারা বলছেন, তাঁরা ঠিক বলছেন না। আমি নিজে একজন চিকিৎসক হয়ে এই ভ্যাক্সিনেশনের পক্ষে। আর থাকবই না কেন, আমরাই লড়াই করছি একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে, আমরাই সবার আগে মৃত্যুকে রুখছি বা রোখার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছি। সেক্ষেত্রে যারা এটা বলছেন, যে না নিতে, তাঁদের সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি মনে করি এই মুহূর্তে করোনার সবচেয়ে নিরাপদ রক্ষাকর্তা ভ্যাক্সিন, আর চিকিৎসার একমাত্র উপায় ভ্যাক্সিনেশন।' □

ভারতীয় টিকায় কারও কোনও ক্ষতি হয়নি

ডা. সমরজিৎ ঘটক

করোনা টিকাকরণ দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে। এই টিকার সরবরাহের জন্য ভারত সরকার পরিবহণ ব্যবস্থাকে সর্বতভাবে কাজে লাগিয়েছে। টিকাকরণ সম্বন্ধে সমাজে ইতিবাচক ও নেতিবাচক মিশ্র প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ছে। যেহেতু করোনা তথা কোভিড-১৯ একটি সম্পূর্ণ নতুন রোগ, তাই এর টিকাকরণ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য ও সঠিক মন্তব্য মানুষের কাছে পৌঁছনো প্রয়োজন। এই রোগের উপর গবেষণা করা বৈজ্ঞানিকদেরই মানায়। একজন আয়ুশ চিকিৎসক হিসেবে আমার সীমিত জ্ঞান ও মতামত ব্যক্ত করছি—

মূলত তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি—

(১) রাজনৈতিক বিরোধিতা, (২) ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার মূলক, (৩) যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান জগতের মানুষের মধ্যে সংশয়।

প্রথমটির কোনো উত্তর নেই। কারণ বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা জেগে ঘুমানোর সমান। এটা ইগনোর করাই ভালো।

দ্বিতীয়টি আমাদের দেশের একাংশের মধ্যে বিদ্যমান। পোলিও টিকাকরণের সময়ও দেখেছি কিছু বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার আশাকর্মী ও নার্সদের তাড়িয়ে দেয়। তাদের ধারণা টিকার নামে হয়তো নির্বীজকরণের কিছু ওষুধ শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা ও সহানুভূতি দিয়ে তাদের বোঝাতে হবে। বাংলাদেশ, বাহরিন ইত্যাদি দেশ কেন ভারতে তৈরি টিকা তাদের দেশে আমদানি করতে চাইছে সেটাও তাদের ভাবা উচিত।

তৃতীয়টি যুক্তিযুক্ত এবং শিক্ষিত সমাজে যুক্তি তর্ক থাকাটা স্বাভাবিক। এই বিষয়ে বলি যে আমাদের কতগুলি দিক ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে—

মূলত বৈজ্ঞানিক ও এক্সপার্ট কমিটি টিকাকে ছাড় দিয়েছেন, কোনো রাজনৈতিক দল নয়। সেখানে 'এত তাড়াহুড়ো কেন? 'আরও এক ধাপ এগলো না কেন'? এইসব প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর এই কাজে যুক্ত বৈজ্ঞানিক, গবেষক ও চিকিৎসকেরা দেবেন, কোনো বিরোধী নেতা বা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নয়। তবে একজন চিকিৎসক হিসেবে মনে হয় যদি স্টেজ থ্রি বা জার্নালে প্রকাশ করতে ৬-৭ বছর সময় লাগে তো ততদিন কি টিকাকরণ স্থগিত রাখা যক্তিযুক্ত? নাকি তার আগের স্টেজে টিকার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এক্সপার্ট কমিটির ছাড়পত্র নিয়ে টিকাকরণ শুরু করাটা ঠিক কাজ? প্রথম বিশ্বের দেশগুলোও তো টিকাকরণ শুরু করে দিয়েছে। তারাও কি অযথা তাড়াহুড়ো করছে? এমনকী প্রথম বিশ্বের নামকরা টিকার ভয়ানক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নরওয়েতে দেখা গেছে, কিন্তু ভারতে প্রস্তুত টিকায় সেরকম হয়নি।

করোনা একটি অতিমারী অর্থাৎ মহামারীর চেয়েও ভয়ানক। বিগত বছরে ফিরে তাকালে মনে পড়ে সেই স্বজনহারাদের কান্না, স্তব্ধ হয়ে যাওয়া জনসমাজ, কাজ হারানো মানুষগুলোর দুঃখ। এই অবস্থায় বিরোধীদের অভিযোগ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বহুদিন ট্রেন বন্ধ রেখেছে, বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করেছে। তবে সেটা জনগণের সুরক্ষার স্বার্থে। সেই সরকার কি চাইবে মানুষের টিকা নিয়ে ক্ষতি হোক? নিখুঁত রান্নার কোনো শেষ নেই, তবে পরিস্থিতি বিশেষে অনেক সময় সেদ্ধভাত আর একট ভাজা করে মায়েরা চটজলদি ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠান। এটা সেরকম নয়তো?

গবেষক, বিজ্ঞানিকগণ আরও সঠিক তথ্য দেবেন। তাঁরা এগিয়ে আসুন, নিশ্চিত উত্তর পাওয়া যাবে। শেষে বলি প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থ চরকসংহিতায় বিমান স্থান অধ্যায়ে জনপদধ্বংস (মহামারী-অতিমারী) বিষয়ে যে বিশদ বিবরণ আছে তাতে আগেভাগে ভেষজ ও ওষুধ মজুত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(লেখক বিশিষ্ট আয়ুশ চিকিৎসক)

কোহলির অভাব বুঝতে দেয়নি রাহানের ভারত

নিলয় সমন্ত

ভারত টেস্ট ক্রিকেটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের লিগ তালিকায় আবার শীর্ষে উঠে এল। গাব্বায় ঐতিহাসিক জয়ের পর ভারতের জয়ের হার হলো ৭১.৭ শতাংশ। ১৩ ম্যাচে ৯টি টেস্টে জয় পেয়েছে ভারত। তাদের পয়েন্ট ৪৩০। ৪২০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ড। ১১টি ম্যাচে ৭টি টেস্ট জয় তাদের।

ভারতের কাছে হারের ফলে অস্ট্রেলিয়া এখন ৩ নম্বরে। ফলে, তাদের ফাইনালে যাওয়া বেশ কঠিন হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ভারত দু ম্যাচ জয়ের ব্যবধানে সিরিজ জিতলেই ফাইনালের জায়গা পাকা। শেষ ৮ বছরে ভারত ঘরের মাঠে ৩৪টি টেস্ট খেলে হেরেছে মাত্র ১টি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় খুব কঠিন হবে বলে মনে হচ্ছে না।

তাই ভারতের সঙ্গে ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে নিউজিল্যান্ডেরও। এবার প্রথম টেস্ট ছিল অ্যাডিলেডে। সেখানে পিঙ্ক বল টেস্টে ৩৬ রানে বিধ্বস্ত হয় টিম ইন্ডিয়া। তারপর বড়ো ধাক্কা ছিল অধিনায়ক বিরাট কোহলির পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে আসা। দলের সেরা ব্যাটসম্যানকে ছাড়া সিরিজে কামব্যাক তখন দূর অস্ত। সিরিজ জয় তো অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু অজিঙ্কা রাহানে অন্যরকম ভেবেছিলেন। মনে করেছিলেন, দেখাই যাক না একটা চেষ্টা করে। একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া, মেলবোর্নে অসাধারণ শতরান, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে শতরান— ছোটোখাটো চেহারার রাহানে যে এতটা ডাকাবুকো তা এই সিরিজে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করাও ছিল কঠিন। বারবার সতীর্থদের সাহস দিয়েছেন। জাদেজার ভুলে রানআউট হওয়ার পরেও সতীর্থকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে প্যাভিলিয়নের পথে হাঁটা দিয়েছেন।

একের পর এক চোট। দলের সেরা বোলারদের একের পর এক ছিটকে যাওয়া। পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়েছিল যে গাব্বায় ১১ জন সুস্থ ক্রিকেটার নামানোই টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে ছিল চ্যালেঞ্জ। একঝাঁক তরুণ এবং তাদের সঙ্গে নাছোড়বান্দা মনোভাব— দুইয়ের মিশেলে এই সিরিজ জয়। রাহানে প্রমাণ করে দিলেন, তিনি সেরা ব্যাটসম্যান। যখন যেমন দলের প্রয়োজন তখন সেভাবেই তিনি ব্যাট করতে পারেন।

অনেকদিন মনে থাকবে সিডনিতে অশ্বিন-রাহানের দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই। সাংবাদিক সম্মেলনে রাহানে বলে গিয়েছিলেন, 'একটা টিম হিসেবে খেলার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কতটা সফল হলাম, তা সিরিজ শেষে বলতে পারব।'

হ্যাঁ তিনি সফল। চূড়ান্ত সফল। ব্রিসবেনে ইতিহাস তৈরির দিনে টিম ইন্ডিয়া যখন 'ল্যাপ অব অনার' দিচ্ছে, ঠিক তখনই রাহানে জাতীয় পতাকাটা চালান করে দিলেন ম্যাচের নায়ক ঋষভের হাতে। পিঠ চাপড়ে একপাশে চলে গেলেন। সম্ভবত বুঝিয়ে দিলেন ওটাই প্রকৃত নেতার কাজ।

স্টপগ্যাপ অধিনায়ক। ইংল্যান্ড সিরিজে নেতা হিসেবে ফিরবেন বিরাটই। রাহানে থাকবেন ডেপুটি হিসেবে। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় কোনও এক কোণে এটা নিশ্চিতভাবে লেখা থাকবে, চোটে বিপর্যস্ত একটা দলকে তিনিই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তরুণদের নিয়ে ক্যাঙারুর দেশে অসিদের চোখে চোখ রেখে লড়াই করার সাহস জুগিয়েছিলেন। যে সাহস তাঁকে সিরিজে তুঙ্গ সাফল্য দিয়েছে।

এদিকে আবার ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টের শেষ দিনে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে নজির গড়লেন ঋষভ পন্থ। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে টপকে গেলেন ২৩ বছর বয়সি পন্থ। ভারতীয় উইকেটকিপারদের মধ্যে সবচেয়ে কম ইনিংস খেলে টেস্টে হাজার রানের রেকর্ড গড়লেন ঋষভ পন্থ। গাব্বায় প্যাট কামিন্সের বলে চার মেরে টেস্টে হাজার রান পূর্ণ করেন ঋষভ পন্থ। ২৭ ইনিংস খেলে হাজার রান করলেন ২৩ বছর বয়সি পন্থ। এর আগে এই নজির ছিল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির। ৩২ ইনিংসে টেস্টে হাজার রান করেন এমএসডি। □

রাজভবনে শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের আত্মীয় সমারোহ

'রাষ্ট্রীয় গুরুত্বের শতবর্ষ প্রাচীন সংস্থা কুমারসভা পুস্তকালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণকল্পে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দবোধ করছি। পদের গরিমার অন্তর্গত আর যা কিছু সহযোগিতার প্রয়োজন তা আমি অবশ্যই করব। পুস্তকালয়ের এই আয়োজনে আমি খুবই আনন্দ অনুভব করছি। আমার বিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় জাগরণ ও সাহিত্যিক-সামাজিক উন্নয়ন হেতু সংস্থার গতিবিধি সমাজকে প্রেরণা দেবে।' গত ১৭ জানুয়ারি রাজভবনে অনুষ্ঠিত আত্মীয় সমারোহে শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের প্রতিনিধি মণ্ডলীর উদ্দেশে কথাগুলি বলেন পশ্চিমবঙ্গের মহামহিম রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল মহোদয় পুস্তকালয়ের নতুন ভবনের জন্য ২১ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করে আশা প্রকাশ করেন যে, বৃহত্তর সমাজের উদারমনা শুভচিন্তকদের সহযোগিতায় পুস্তকালয়ের মর্যাদার অনুরূপ ভবন শীঘ্রই নির্মাণ হবে।

পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে সংস্থার অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী বলেন, রাজ্যপাল মহোদয়ের সদাশয়তা শুধু অভূতপূর্ব নয়, বরং সমস্ত স্তরের কার্যকর্তাদের জন্য প্রেরণাদায়ী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ড. তারা দুগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সজ্জন কুমার তুলসীয়ান। পুস্তকালয়ের প্রতিনিধি মণ্ডলে উপস্থিত ছিলেন মহাবীর বজাজ, ভাগীরথ চাণ্ডক, শার্দূল সিংহ জৈন, নন্দলাল সিংহানিয়া, অরুণপ্রকাশ মল্লাবত, বংশীধর শর্মা প্রমুখ।

সিউড়ীতে তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১৭ জানুয়ারি সিউড়ী লীজ ক্লাব শতবার্ষিকী সভাকক্ষে দিনভর অনুষ্ঠিত হয় এক বর্ণাঢ্য সারস্বত অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্বলন, শঙ্খধ্বনি ও বেদমন্ত্র উচ্চরণে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। সারাদিনের এই অনুষ্ঠানে স্মারক সম্মান, স্মারক বক্তৃতা, পত্রিকা প্রকাশ, পুরস্কার প্রদান ও আন্তঃজেলা সাহিত্যপাঠের আয়োজন ছিল। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যব্যক্তিত্ব মহাদেব দত্ত, সাহিত্য সমাজের সভাপতি বিপিন মুখোপাধ্যায়, কার্যকরী সভাপতি পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই চারজনের হাতে স্মারক সম্মান — ব্রোঞ্জ নির্মিত তারাশঙ্কর মূর্তি তুলে দেন সাহিত্যসমাজের সম্পাদক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তব্য রাখেন নাট্যব্যক্তিত্ব মহাদেব দত্ত ও তারাশঙ্কর প্রপৌত্র ড. অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। স্মারক বক্তৃতার কথাসূত্রে সম্পাদক তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে অর্ধশতাব্দীকালের সারস্বত চর্চার ইতিহাসে তারাশঙ্করের প্রতি তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্যসমাজের এ এক স্বতন্ত্র বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রয়াস। পরে তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্যসমাজের 'অরণ্য-অগ্নি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। ১৮০ পৃষ্ঠার এই পত্রিকায় তারাশঙ্করের একটি অগ্রন্থিত ভাষণ যেমন সংকলিত হয়েছে, তেমনি রয়েছে সাহিত্যিক কণা সেনের একটি অপ্রকাশিত রচনা। এছাড়া রয়েছে বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও কলকাতার বিশিষ্ট লেখকদের রচনা। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার— রৌপ্য নির্মিত তারাশঙ্কর মূর্তি। তারাশঙ্করের নাটকচর্চায়

জেলার এক কিংবদন্তী লাভপুরের নাট্যব্যক্তিত্ব সুপ্রভাত মিশ্রের হাতে পুরস্কারটি তুলে দেন সাহিত্যসমাজের সভাপতি বিপিন মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠনের দ্বিতীয় ভাগে শুরু হয় আন্তঃজেলা সাহিত্যপাঠ। এই পর্বে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সমুদ্র চৌধুরী তারাশঙ্করের গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন ড. মনোজ রায়, শ্রীমতী অলোকা গাঙ্গুলি, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দত্ত ও অরণি-আরণ্যক। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন নিতাই প্রসাদ ঘোষ, সুশান্ত রাহা, বিধানচন্দ্র রায়, চন্দন ঘোষ, অধীর গড়াই ও পার্থ চৌধুরী।

ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের কৃষি আলোচনাসভা-সহ রক্ত ও কম্বলদান শিবির

ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে গত ১১ জানুয়ারি বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর নয়াদা তরুণ সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে কৃষি আলাচনাসভার আয়োজন করা হয়। সেই সঙ্গে রক্তদান শিবির ও এলাকার দুঃস্থদের কম্বল বিতরণেরও কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক কেদার মাল, ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের পূর্বতন কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা অজিত বারিক, বাঁকুড়া জেলা সভাপতি মনতোষ বসু। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমরেন্দ্র পাত্র। এলাকার ২০০ জন কৃষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। রক্তদান শিবিরে ১৫ জন মহিলা-সহ ৫৫ জন রক্ত দান করেন। ৫০ জন দুঃস্থকে কম্বল দান করা হয়।

সংস্কার ভারতীর স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের মতো এবারও উত্তরের সংস্কার ভারতী গাজোল শাখার উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তী। সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন শাখার স্থানীয় সদস্যরা। বাঁশী বাজিয়ে শোনান অতুল মণ্ডল। আবৃত্তি পরিবেশন করেন স্নেহা দাস ও সুপর্ণা সরকার। গিটার বাজিয়ে শোনান বুদ্ধদেব দাস। বক্তব্য রাখেন পরেশ সরকার ও পুষ্প সরকার। উৎসবে বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয় দূরদর্শন শিল্পী জয়া চক্রবর্তীর সংগীত পরিবেশনে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চঞ্চলপ্রসাদ চক্রবর্তী।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে গত ১০ জানুয়ারি বিশ্ব হিন্দি দিবসের শুভলগ্নে এক আত্মীয় সম্মেলনে কবি বিষ্ণু সিখওয়াল 'বিশন'-এর কবিতা সংগ্রহ 'এহসাস জিন্দগী কে'-গ্রন্থের প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নতুন দিল্লির ভারতীয় জন-সঞ্চার সংস্থার মহানির্দেশক প্রফেসর সঞ্জয় দ্বিবেদীর করকমলে পুস্তক প্রকাশ করা হয়। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, রাজস্থানি স্তম্ভলেখক বংশীধর শর্মা, পুস্তকালয়ের সচিব মহাবীর বজাজ, বিশিষ্ট কবি অনিল ওঝা, প্রফেসর ঋষিকেশ রায়, যোগেশরাজ উপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু বিশিষ্ট সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে কাকোরি রেল ডাকাতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

কৌশিক রায়

১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট। মধ্যরাতের নিঃস্তব্ধতা, মিশকালো অন্ধকারের মতোই যেন গ্রাস করেছে চারদিক। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ জংশন স্টেশনের দিকে ছুটে চলেছে ৮ নম্বর ডাউন ট্রেনটি। ট্রেনের একটি কামরা থেকে আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে বেরিয়ে এল একজন ব্যক্তি। গরমকাল। এই সময়েও গায়ে আলোয়ান কেন? কৌতূহলী হয়ে উঠল ট্রেনের সশস্ত্র রক্ষী। সে এগিয়ে আসতেই বিদ্যুতের মতো বজ্রমুষ্ঠি চালাল সেই রহস্যাবৃত ব্যক্তি। হাতিয়ার বের করার সময়ই পাওয়া গেল না। সংজ্ঞাহীন রক্ষীর শরীর ডিঙিয়ে পেশিবহুল হাতে ট্রেনের অ্যালার্ম চেন টানল ওই ব্যক্তিটি। সামনেই কাকোরি নামের একটি ছোট্ট শহর। ট্রেনটি থামতে না থামতেই 'লাফ দিয়ে কয়েকটি কামরাতে উঠে পড়ল আরও কয়েকজন যুবক। হতচকিত, শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভার ও গার্ডসাহেব এবং বাদবাকি গোরা রক্ষীদের কাবু করতে বেশি সময় লাগল না রামপ্রসাদ বিসমিল, ঠাকুর রোশন সিংহ এবং আসফাকুল্লা নামক তিন অকুতোভয় বিপ্লবীর। গার্ডসাহেবের কামরাতেই ছিল ভারত থেকে ব্রিটিশ সরকারের কোষাগারে অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়া টাকার থলে। দেশের দরিদ্র মানুষের সর্বনাশ করে শ্বেত ইঁদুরের লোভের ঘরে ওই টাকা দিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না চরমপন্থী সংগ্রামে চিরবিশ্বাসী এবং 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' নামক গোপন বিপ্লবী সংস্থার এই তিন দেশপ্রেমিক যুবক। রামপ্রসাদ, ঠাকুর রোশন আসফাক উল্লাহ্-র হাতে ছিল ইংরেজ শাসকের চিরশত্রু জার্মানির তৈরি 'মাউজার' পিস্তল। ওড়িশার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর তীরে জাঁদরেল ইংরেজ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের বাহিনীর বিরুদ্ধে অসম সংগ্রামেও বাঘা যতীন, জ্যোতিষ পাল ও চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী ব্যবহার করেছিলেন জার্মান 'রডা কোম্পানি'র তৈরি করা এই একনলা মাউজার পিস্তল। কাকোরি রেল ডাকাতি থেকে প্রাপ্ত অর্থের কিছুটা এই মাউজার পিস্তল কেনার জন্য খরচ করার ইচ্ছা ছিল হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের বিপ্লবীদের। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের আদর্শে, আয়ারল্যান্ডের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 'সিনফিন' দলের অনুসরণে ভারতে সশস্ত্র সংগ্রামের পথটিকে আরও চওড়া করে তুলতে চেয়েছিলেন এই বিপ্লবীরা। 'যুগান্তর' 'গদর পার্টি' ও 'অনুশীলন সমিতি'র মতো গোপন বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গেও এঁদের যোগাযোগ ছিল। কাকোরি ট্রেন ডাকাতি ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় যুবসমাজকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করুক, এটাই চেয়েছিলেন রামপ্রসাদ, রোশন, আসফাক উল্লাহ্‌রা।

(বাঁ দিক থেকে) আসফাকুল্লা, রামপ্রসাদ বিসমিল, ঠাকুর রোশণ সিংহ।

বলাই বাহুল্য, কাকোরি রেল ডাকাতি ইংরেজ সরকারের আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত করল। দেশ জুড়ে ব্রিটিশের পোষ্য দেশীয় পুলিশবাহিনী ও গোয়েন্দাদের কাজে লাগান হলো এই ডাকাতির মূল

কাণ্ডারিদের ধরার জন্য। এই রেল ডাকতিতে রামপ্রসাদ, আসফাকুল্লা ও ঠাকুর রোশন সিংহকে সাহায্য করেছিলেন কয়েকজন বাঙ্গালি বিপ্লবী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াগরাজের (এলাহাবাদ) ভূপেন্দ্রনাথ স্যান্যাল, বেনারসের মন্মথনাথ গুপ্ত, ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, দেবীদত্ত ভট্টাচার্য, বাঙ্গলার রাজেন্দ্র লাহিড়ী, যোগেশ চন্দ্র চ্যাটার্জি, কালিদাস বোস, কানপুরের সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং লক্ষ্ণৌয়ের শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। মথুরার শিবচরণ লাল শর্মার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলেও তিনি পুদুচেরীতে পালিয়ে যান। মীরাট থেকে ধরা পড়েন বিষ্ণুচরণ ডাবলিশ। উত্তরপ্রদেশের শাহরাহানপুর থেকে গ্রেপ্তার হন রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকুল্লা খান ও ঠাকুর রোশন সিংহ। ওই শাহরাহানপুর থেকেই ওই তিন বিপ্লবীর সঙ্গে গ্রেপ্তার বরণ করেন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের আরও কয়েকজন সদস্য— বানারসী লাল, প্রেমকৃষ্ণ খান্না, মদললাল, লালা হরগোবিন্দ ও রাম দত্ত শুক্লা। বিহারে চম্পারণে, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূত্রপাতের স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় কমলনাথ তিওয়ারীকে। দক্ষিণেশ্বরে বোমাবর্ষণের মামলাতে আগে থেকেই অভিযুক্ত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ও ঋষি অরবিন্দ ঘোষের অন্যতম মন্ত্রশিষ্য রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। ধৃত বিপ্লবীদের মধ্যে বেনারসের দামোদর স্বরূপ শেঠকে অসুস্থতার জন্য মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগারের মধ্যে অনশন আন্দোলন শুরু করেন রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকুল্লা খান ও ঠাকুর রোশন সিংহ। এঁদের দাবি ছিল জন্মভূমির ব্রিটিশ-শৃঙ্খল মোচনের জন্য এঁরা ট্রেন ডাকাতি করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা রাজনৈতিক বন্দি। সুতরাং, সাধারণ অপরাধীদের মতো উর্দি তাঁরা কারাগারের মধ্যে পরতে চান না। ব্রিটিশ কারাধ্যক্ষ বিস্মিত হয়ে যান এক ক্ষত্রিয়, এক উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ এবং এক মুসলমান যুবক— রামপ্রসাদ, রোশন ও আসফাকুল্লার মধ্যে অটুট, অমলিন বন্ধুত্বকে দেখে। পরবর্তীকালে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাবাহিনীতেও মেজর ধীলোঁ, কর্নেল থিবি, ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন, কর্নেল লোগনাথান, মেজর-জেনারেল শাহানওয়াজ খান এবং কর্নেল হবিবুর রহমানের মতো দেশপ্রেমিক সেনানীদের মধ্যেও এই অসাম্প্রদায়িকতাকে লক্ষ্য করা গেছে।

১৯২৬ সালের ২১ মে কাকোরি রেল ডাকাতির মামলার শুনানি শুরু হয় বিচারক অ্যালবার্ট হ্যামিলটন, আব্বাস সালিম খান, বনোয়ারী লাল ভার্গব, জ্ঞান চ্যাটার্জি এবং মোহাম্মদ আইয়ুফের তত্ত্বাবধানে। ব্রিটিশ প্রভুত্বের বশংবদ এই বিচারকরা শেষপর্যন্ত রামপ্রসাদ বিসমিল, ঠাকুর রোশন সিংহ ও আসফাকুল্লাকে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে হাসিমুখে জল্লাদের হাত থেকে ফাঁসির দড়ি নিয়ে তাঁরা নিজেরাই গলায় পরলেন। তাঁদের প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে গণপ্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল। গোবিন্দবল্লভ পন্থ, অজিত প্রসাদ জৈন, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, আচার্য নরেন্দ্রদেব, শিব প্রসাদ গুপ্তার মতো বহু বুদ্ধিজীবী কাকোরি রেল ডাকাতির অভিযুক্তদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। অবশ্য, ব্রিটিশ প্রহসন-আদালতে পাবলিক প্রসিকিউটর পদে নিযুক্ত লক্ষ্ণৌয়ের আইনজীবী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আত্মীয় পণ্ডিত জগৎ নারায়ণ কিন্তু রামপ্রসাদ, রোশন, আসফাকুল্লাদেরকে 'রাজদ্রোহী' রূপে নিন্দা করেন ও তাঁদের পক্ষ সমর্থন করেননি। রামপ্রসাদরাও সরাসরি জানিয়ে দেন— দেশের মুক্তির পথে শহিদের গৌরব চান তাঁরা। তাই, কোনও অনুগ্রহ যেন তাঁদের দেখান না হয়। তদানীন্তন ভাইসরয় এডওয়ার্ড প্যাট্রিক লিন্ডলে উডও তাঁদের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। ১৯২৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর প্রাণদণ্ড হয় এই তিন অকুতোভয় যুবকের। কালাপানি পেরিয়ে আন্দামানের সেলুলার বন্দিশালাতে যাবজ্জীবন দীপান্তর হয় মন্মথনাথ গুপ্ত, যোগেশ চন্দ্র চ্যাটার্জি, গোবিন্দ চরণ কর ও রামকৃষ্ণ ক্ষত্রীর। রামপ্রসাদ, রোশন, আসকাফের সঙ্গে কাকোরি রেল ডাকাতিতে প্রাণদণ্ড হয় বঙ্গ বিপ্লবী সন্তান— রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীরও।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মস্তিষ্ক যেমন ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন, তেমনি কাকোরি রেল লুণ্ঠনের দুঃসাহসিক আবর্তটিও রচিত হয়েছিল একাধারে উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত ভাষাতে পারঙ্গম, কবি এবং স্বামী দয়ানন্দের আর্য সমাজের অন্যতম অনুসারী ৩০ বছর বয়স্ক রামপ্রসাদ বিসমিলকে ঘিরে। শিখ বিপ্লবী ভাই পরমানন্দের প্রাণদণ্ড কলেজ ছাত্র রামপ্রসাদকে উদ্দীপিত করে ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। ভাই পরমানন্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষাতে একটি কবিতাও লেখেন তিনি। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে, উত্তর প্রদেশের গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতার লড়াইয়ে যুবসমাজকে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল। তাঁর লেখা দুটি বিদ্রোহাত্মক কবিতা সংগ্রহ 'মন কি লহর' ও 'ক্রান্তি গীতাঞ্জলি' যেন কাজী নজরুলের 'অগ্নিবীণা' ও 'সর্বহারা' কাব্য সংগ্রহ এবং তামিল কবি- সুব্রহ্মনীয়া ভারতীর কবিতার মতোই দেশবাসীর মনে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবের সুপ্ত আগ্নেয়গিরিকে জীবন্ত করে তুলেছিল। মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে মৌলানা হসরত মেহানির সঙ্গে ভারতের জন্য পূর্ণ স্বরাজের দাবি তুলেছিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে অসহযোগ আন্দোলনকারীদের অগ্নিসংযোগে ২২ জন পুলিশকর্মী থানার মধ্যে আগুনে পুড়ে মারা যায়। এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করেন। নেতাজী ও সর্দার ভগৎ সিংহের মতো রামপ্রসাদ বিসমিলও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে গান্ধীজীর এই হঠকারী সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। বিসমিল জানান অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে বলীয়ান ও কূচক্রী ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়ান যাবে না। ১৯২৩ সালে প্রয়াগরাজে শচীন্দ্রনাথ স্যান্যাল ও যাদুগোপাল মুখার্জির সঙ্গে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের বৈপ্লবিক কার্যনীতি বা 'ইয়েলো পেপার কনস্টিটিউশন' তৈরি করেন রামপ্রসাদ বিসমিল। কাকোরির কাছে ট্রেনের কামরাতে তিনি যখন গার্ড ও রক্ষীদের কাবু করে আসফাক উল্লাহকে নিয়ে টাকার সিন্দুক খুলছিলেন, তখন দুর্ঘটনাবশত সহযোগী বিপ্লবী মন্মথ নাথ গুপ্তর হাতে থাকা 'সি-৯৬' মাউজার পিস্তল থেকে বুলেট ছুটে গিয়ে হত্যা করে মহিলা-কামরাতে থাকা স্ত্রীর খোঁজ নিতে যাওয়া আহমেদ আলি নামক এক যাত্রীকে। অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের জুড়ি গাড়ি দুই নির্দোষ ব্রিটিশ মহিলাকে না জেনে হত্যা করার দায় যেমন মাথায় পেতে নিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম, তেমনি এই নির্দোষ যাত্রীর মৃত্যুর দায় ও অনুশোচনার সঙ্গে ফাঁসির মঞ্চে স্বীকার করেছিলেন কাকোরি রেল ডাকাতির মহানায়কেরা।

বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের শাহরাহানপুর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে পূর্ব রেলওয়ের তৈরি করা ছোটো স্টেশনটি রামপ্রসাদ বিসমিলের অগ্নিস্রাবী স্মৃতি বহন করছে। ▫

ভারতের একটি প্রাচীন সাধনা বিপশ্যনা

বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়

প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে ভগবান বুদ্ধ দ্বারা প্রচলিত এই সাধনা ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ লাভের ৫০০ বছর পর হারিয়ে গিয়েছিল। যা আজ আবার ধীরে ধীরে সারা দেশে তথা বিশ্বের অনেক দেশে বিপশ্যনা ধ্যান নামে বহুল প্রচলিত। সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা যার জন্ম ব্রহ্মদেশে, তিনি সেখানে কোনো এক সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে চলতে থাকা এই বিদ্যা গুরুদেব স্বর্গীয় ইউ বা খিনের কাছে ১৪ বছর ধরে অর্জন করে ১৯৬৯ সালে ভারতে এই সাধনার শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। তারও সাত বছর পর ১৯৭৬ সালে তিনি ইগতপুরীতে (নাসিকের কাছে) ধম্মগিরি নামে বিপশ্যনা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমিতে ধ্যানকেন্দ্র শুরু করেন। আজ সারা দেশে ধম্ম গঙ্গা (কলকাতা), ধম্ম শিমেরু (সিকিম), ধম্ম থলী (জয়পুর) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে কয়েক শত কেন্দ্র চলছে— যেখানে ১০ দিনের প্রশিক্ষণ বর্গে হাজার হাজার পুরুষ, মহিলা বিশেষ করে যুবক-যুবতীরা এই সাধনার মাধ্যমে নিজেকে জানার এবং বিকার মুক্ত হয়ে নির্মল, শুদ্ধ চিত্ত নির্মাণের চেষ্টা করেছে।

বিপশ্যনা অর্থাৎ বিশুদ্ধরূপে, বিশেষভাবে দেখা। এই সাধনার উদ্দেশ্য নিজের শরীরের সংবেদনাকে প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি করে 'শীল', 'সমাধি' ও 'প্রজ্ঞা' জাগরণ করে মনের বিকার দূর করে সবকিছু স্রষ্টাভাব, তটস্থভাব, সাক্ষীভাব নিয়ে দেখা এবং সুন্দর জীবন লাভ করা। বিপশ্যনা অর্থাৎ আত্মাবলোকন। নিজেকে দেখা, নিজেকে জানা ও নিজেকে বোঝা। যা সত্য, যা নিত্য তাকে উপলব্ধি করা। নিজের অনুভূতির দ্বারা সবকিছুই যে অনিত্য এই বোধ জাগানো।

পঞ্চশীল অর্থাৎ ১। হত্যা না করা, ২। মিথ্যা কথা না বলা, ৩। ব্যভিচার না করা, ৪। নেশা না করা ও ৫। চুরি না করা। দশ পারমিতা অর্থাৎ ১। দান পারমী, ২। শীল পারমী, ৩। নৈষ্ক্রম্য পারমী, ৪। প্রজ্ঞা পারমী, ৫। বীর্য পারমী, ৬। ক্ষান্তি পারমী, ৭। সত্য পারমী, ৮। অধিষ্ঠান পারমী, ৯। মৈত্রী পারমী, ১০। উপেক্ষা পারমী। এগুলি জীবনে কঠোরভাবে পালন করা এবং চিন্তনময়ী প্রজ্ঞার জাগরণ ঘটানো শুদ্ধ জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ সর্বদা সমানভাবের বিকাশ ঘটানো। মনের মধ্যে ভালো বা খারাপ, সুখ বা দুঃখকে সমানভাবে দেখার অভ্যাস করা এবং সবকিছু অনিত্য বা অস্থায়ী সেই অবস্থাকে বজায় রাখা। ধীরে ধীরে অরহন্ত হয়ে হওয়া অর্থাৎ বীতরাগ (আসক্তি সম্বন্ধিত শব্দ) বীতদ্বেষ, বীতমোহ, বীতভয় হয়ে অনাসক্ত হৃদয় নির্মাণ করে শুদ্ধচিত্ত, নির্মল চিত্ত নির্মাণ করা— সিদ্ধার্থ বা গৌতম এই বোধ প্রাপ্ত করেই ভগবান বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেজন্য গৌতম শরণং গচ্ছামি নয়, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বলা হয়।

of hatred and ill will, May not a

trace remain

May love and good will, Fill body mind and life —অর্থাৎ মনের মধ্যে দ্বেষ ও দুর্ভাবের কোনো স্থান যেন না থাকে, স্নেহ ও সদ্‌ভাব দিয়ে শরীর, মন ও প্রাণ ভরে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কখনো কখনো বলা হয়েছে—

Deeper the craving, Deeper is the Caversion

Deeper the Caversion, Deeper is the affliction —অর্থাৎ যত গভীর রাগ (আসক্তি) ততটাই গভীর হয় দ্বেষ, যত গভীর দ্বেষ তত গভীর হয় ক্লেশ।

এই ধ্যান শেখার জন্য অনলাইনের মাধ্যমে Vipassana বা Dhamma.org-এর সাইটে গিয়ে স্থান, সময় ইত্যাদি বিস্তৃত বিবরণ পেতে পারেন। পূর্ণ দশ দিনের ধ্যান শিবির হয়। ১৫ বছর তদূর্ধ্ব শারীরিক সুস্থ পুরুষ ও মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারেন। মহিলাদের সম্পূর্ণরূপে— (থাকা, খাওয়া ধ্যান ব্যবস্থা) আলাদা থাকে। সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজী সংস্থার Principal Teacher, কিন্তু Asst. Teacher (সহ-আচার্য) এই শিবিরগুলি সঞ্চালন করেন। বাচ্চাদের জন্য কোথাও কোথাও দু'দিনের কোর্স হয়। প্রথম দিনে অর্থাৎ পঞ্জীকরণের দিনেই মোবাইল সহ সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী জমা করে দিতে হয়। থাকার জন্য ১০/১২ ফুটের কুটিরে দুজন করে থাকার ব্যবস্থা থাকে, কোথাও কোথাও ডরমিটরিও থাকে। প্রত্যেক রুমে অ্যাটাচড বাথরুম। প্রথম দিন থেকেই খেতে বসার স্থান, ধ্যানগৃহে বসার স্থান, শূন্যাগারে PAGODA ধ্যান করার জন্য সেল ক্রমাঙ্ক নিশ্চিত করে দেওয়া হয় এমনকী খাবার জন্য থালা, গ্লাস, বাটি, চামচ ও মুছে রাখার জন্য তোয়ালে নির্ধারিত করে দেওয়া থাকে। খাওয়ার পর ধুয়ে মুছে ওই নির্দিষ্ট টেবিলেই ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হয়।

ভোর ৪টায় জাগরণ। ৪-৩০ থেকে ধ্যান শুরু হয়। সারাদিনে ১২ ঘণ্টা ধ্যান। কখনও সামূহিক, কখনও pagoda বা শূন্যাগারের ৪/৭ ফিটের অন্ধকার সেলে আলাদা আলাদা ভাবে। তার মধ্যে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮-৩০ পর্যন্ত প্রধান আচার্যের প্রবচন (Discorse)।

সকাল ৬-৩০টায় স্বল্পাহার, দুপুর ১১টায় ভোজন, বিকেল ৫টায় স্বল্পাহার। পুরনো সাধকদের জন্য দুপুর ১১টার ভোজনের পর আর কোনো খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না। বিকাল ৫টায় লেবু জলের ব্যবস্থা থাকে। শারীরিক কারণে অনুমতি নিয়েই ওষুধ বা ডাক্তারের কিছু নির্দেশ থাকলে পালন করতে পারবেন। এই শিবিরগুলির সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'আর্য মৌন'। কোনোভাবে, কোনো অবস্থাতেই কথা বলা যাবে না। শুধুমাত্র বাণী দ্বারা মৌন পালনই নয়, শারীরিক বা চোখের ইশারা করাও নয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মনের দিক থেকে মৌন পালন। কোনোকিছু লেখা, পড়া, দেখা (টিভি ইত্যাদির) কোনো অনুমতি নেই। 'ধম্ম সেবক' অর্থাৎ যারা ব্যবস্থা দেখে তারাও সম্পূর্ণরূপে নীরবতা পালন করেন। ব্যবস্থা সংক্রান্ত বা অন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় থাকলে লিখে স্লিপ দিয়ে দিলে তার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

খাওয়ার ব্যবস্থা self service, যদিও করোনার কারণে ধম্ম সেবকরা গ্লাভস পরে পরিবেশন করার কাজ করছে। অধিকাধিক স্থানে Sanistizer এবং খাওয়ার পর হাত ধোওয়ার কল Handsfree করে রাখা আছে। সমস্ত স্থানে যাবার জন্য ৬ ফুট দূরত্ব কঠোর ভাবে পালন করা হয়।

প্রবচনে পুরনো পালি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ধ্যানে ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য থাকার ঘর, ধ্যানাগার, প্যাগোডা সব স্থানে নেটের দরজা লাগানো যাতে মশা, মাছি, কীটপতঙ্গ কোনভাবেই ঢুকতে না পারে। সমস্ত Meditation Centre প্রকৃতির কোলে তৈরি করা হয়েছে যেখানে কীট, পতঙ্গ ও পাখির কলরব ছাড়া আর কোনো শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। শিবির সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক দানের মাধ্যমেই চলে।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। ভবতু সব্ব মঙ্গলম্। BE HAPPY।

ধম্মথলী, রাজস্থান

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশুদের হত্যা করেছিল জ্যোতিবাবুর পুলিশ

গোপাল চক্রবর্তী

দেশভাগের বলি হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে পশ্চিমবঙ্গে। আশ্রয়হীন, সহায়হীন, সম্বলহীন। দেশভাগের প্রথমদিকে প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলের নমঃশূদ্রদের নেতা যোগেন্দ্র মণ্ডল তাদের বোঝালেন বর্ণহিন্দুদের থেকে এই মুসলমানেরা আমাদের অনেক কাছের মানুষ। তিনি মুসলিম লিগের সঙ্গে তফশিলভুক্ত হিন্দুদের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার সময় এই তপশিলি হিন্দুদের সমর্থনের জন্য মুসলিম লিগ এক অভিন্ন স্বার্থের কথা বলেছিল। মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে তপশিলি হিন্দুদের ওপরেও নির্যাতন অবসানের আশ্বাস দিয়েছিল মুসলিম লিগ। কিন্তু সেটা শুধু আশ্বাসই ছিল, বাস্তবটা ছিল অন্যরকম। লক্ষণীয়, চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গে ঘটে যাওয়া হিন্দুদের ওপর মুসলমান আক্রমণ আসলে ছিল নমশূদ্রদের ওপর অত্যাচার। মুসলিম লিগ নেতাদের প্রতারণার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় মুসলমানদের কাছ থেকে নির্মম আঘাত পাওয়ার পরে। দেশের মাটিকে যারা মা বসুমতী বলে পুজো দিতেন সেই মানুষগুলিই একদিন সেই মাকে ছাড়তে বাধ্য হলেন। পা বাড়ালেন অজানার উদ্দেশ্যে। যোগেন্দ্র মণ্ডলকেও প্রাণের ভয়ে পূর্বপাকিস্তান থেকে রাতারাতি ভারতে পালিয়ে আসতে হলো। শিয়ালদহ স্টেশনে নেমেছিল নমশূদ্র উদ্বাস্তুর ঢল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, খোলামাঠ, গাছতলা সর্বত্র উদ্বাস্তু। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পুনর্বাসন দেবার একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু বাদ সাধে কমিউনিস্টরা। তারা উদ্বাস্তুদের বোঝালো আন্দামানে যাওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু, ম্যালেরিয়া, উদরপীড়া কিংবা আদিম অধিবাসীদের বিষাক্ত তিরে। তবুও আন্দামানের জাহাজে অনেকে উঠেছিল। কমিউনিস্টদের কেউ কেউ উদ্বাস্তু সেজে সেই জাহাজে উঠে মাঝদরিয়ায় জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যার অভিনয় করে সেই জাহাজ খিদিরপুরে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করল। ব্যর্থ হলো ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনা। অথচ যারা কমিউনিস্টদের প্ররোচনায় পা না দিয়ে কোনোভাবে আন্দামানে পৌঁছাতে পেরেছিল তাদের সেখানে আজ সোনার সংসার। কমিউনিস্টরা সেদিন বাদ না সাধলে আন্দামানে

দ্বীপ ছেড়ে পালাচ্ছেন শরণার্থীরা।

ফ ঃ ৫

গড়ে উঠত আরেকটা বঙ্গভূমি।

তখন কেন্দ্রেও কংগ্রেস সরকার, পশ্চিমবঙ্গেও। দুই সরকারেরই গোঁ তারা পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেবে না। সব হারানো উদ্বাস্তুদের সংখ্যা কিন্তু বেড়েই চলেছে। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় বিধানচন্দ্র রায় মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে দণ্ডকারণ্য নামক এক বিশাল ভূখণ্ডে পূর্বপাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি করলেন দণ্ডকারণ্য ডেভলপমেন্ট অথোরিটি। এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনকে। শক্ত হাতে হাল ধরলেও তাঁর অকাল প্রয়াণে শোচনীয় হয় দণ্ডকারণ্যের হাল। দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু পর্ষদের পরবর্তী চেয়ারম্যান হলেন বিখ্যাত আইসিএস শৈবাল গুপ্ত। তিনি কার্যভার নেওয়ার পর ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে আবার শুরু হলো হিন্দুদের ওপর আক্রমণ। পশ্চিমবঙ্গের ১৪শো মাইল সীমান্ত দিয়ে আবার নামল উদ্বাস্তুদের ঢল। কোনো রকমে প্রাণটুকু নিয়ে যারা এপারে পালিয়ে এল তারা তো এই ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের কোনও সহানুভূতি পেলই না, বরং মুখোমুখি হলো এক চরম বঞ্চনার। এই দশ-বারো লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু যেহেতু পাকিস্তানের নাগরিক, তাই ১৯৫৮ সালের নেহরুর সেই কুখ্যাত 'দার্জিলিং চুক্তি' অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরের পর যারা ভারতে প্রবেশ করবে তাদের জন্য সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কোনো সুযোগ থাকবে না। এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে একটি চিঠি লেখেন। জবাবে নেহরু লিখলেন, 'দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের দরজা এতটা খুলে দিলে, পূর্ববাংলার হিন্দুদের মধ্যে দেশ ত্যাগের হিড়িক পড়ে যাবে এবং তারা দলে দলে এদেশের দিকে পা বাড়াবে।' এই একটি বাক্যেই দেশভাগের বলি পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য হিন্দুদের প্রতি ক্ষমতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত নেহরুর নির্মম মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরো শেয়ালদা স্টেশন চত্বর তখন উদ্বাস্তুদের দখলে। এছাড়াও যারা যেখানে খালি জায়গা পেয়েছে সেখানেই গড়ে তুলেছে অস্থায়ী আস্তানা। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী এক প্রতিনিধি দল পাঠালেন অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য। সেই প্রতিনিধি দলের পরামর্শে কেন্দ্র সরকার এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে স্বীকৃত হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে নয় তাদের সবাইকে যেতে হবে দণ্ডকারণ্যে। দিনের পর দিন খোলা আকাশের নীচে থাকা অসহায় মানুষগুলো নিরুপায় হয়ে মন্দের ভালো দণ্ডকারণ্যকেই বেছে নিতে বাধ্য হলো। মালবাহী ট্রেনে গোরু মোষের মতো মানুষগুলোকে নিয়ে যাওয়া হলো দণ্ডকারণ্যে। যাওয়ার পথে কত মানুষ যে মারা গেল তার কোনো হিসাব পাওয়া গেল না।

প্রথমদিকে ঠিক ঠিক চললেও সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে দণ্ডকারণ্য হয়ে ওঠে বিভীষিকা। এর কারণ সরকারি অবহেলা, স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘাত, আর প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ। দণ্ডকারণ্য যাত্রীদের বঙ্গীয় কমিউনিস্টরা আশ্বাস দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে তারা ক্ষমতায় এলে দণ্ডকারণ্য থেকে বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের তারা ফিরিয়ে আনবে।

১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে অজয় মুখার্জি ও জ্যোতি বসু দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিয়ে একেবারে নিশ্চুপ ছিলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। তাঁরও এই উদ্বাস্তুদের নিয়ে কোনওরূপ মাথাব্যথা ছিল না। বেঁচে থাকার ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও না থাকায় দলে দলে উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার চেষ্টা করলো। কিন্তু সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের পুলিশ তাদের মেরে ধরে, জোর জবরদস্তি করে আবার দণ্ডকারণ্যের ট্রেনে তুলে দিল। দেশভাগের বিপর্যয়ের ভার সরকার নিতে চাইল না। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায় এলে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুরাও একটা আশার আলো দেখতে পায়। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দণ্ডকারণ্যের মানা উদ্বাস্তু শিবিরে হঠাৎ হাজির মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নিতান্ত কাছের মানুষ মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি। মানা উদ্বাস্তু শিবিরে এক জমায়েতে তিনি বললেন, 'আমরা বামপন্থীরা এখন পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় এসেছি। আমরা এখনও বলছি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন চাই। এই দুর্বিষহ জীবন থেকে আমরা উদ্বাস্তুদের মুক্তি দেব।'

তাঁর আশ্বাসের উপর ভরসা করে ১৯৭৮-এর মার্চের মাঝামাঝি দণ্ডকারণ্য ছেড়ে প্রায় হাজার কুড়ি উদ্বাস্তু এসে হাজির। হাওড়া স্টেশন, প্রিন্সেপ ঘাট, ময়দান সর্বত্র ছিন্নমূল মানুষের ঢল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন কেন্দ্র ও মধ্যপ্রদেশের সরকারকে উদ্বাস্তুদের আটকাতে বললেন। এদিকে সেনাবাহিনী ময়দান থেকে উদ্বাস্তুদের সরানোর জন্য পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করলে পুলিশের তাড়া খেয়ে এই অসহায় মানুষগুলো ছড়িয়ে পড়ল বারাসাত, বসিরহাট, হাসনাবাদে। কিছু উদ্বাস্তুকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো খড়্গপুরের দিকে। দণ্ডকারণ্য ফেরত উদ্বাস্তুর সংখ্যা তখন প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি। কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু মধ্যমগ্রাম বাদুরিয়া হাটসংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নিলে স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এই হিন্দু উদ্বাস্তুদের মুসলমানরা মেনে নিতে পারেনি। হাসনাবাদ রেল স্টেশন ও ইছামতীর পাড় তখন উদ্বাস্তুদের দখলে। স্বাধীনতার বলি আশ্রয়হীন অন্নহীন হাজার হাজার মানুষ খোলা আকাশের নীচে। জ্যোতি বসুর সরকারের সঙ্গে ততদিনে মুসলমানদের একটা লবি তৈরি হয়ে গেছে। নিশ্চিত ভোটব্যাঙ্ক এই মুসলমানদের চটাতে চায়নি জ্যোতিবাবুর সরকার, অতএব খেদাও উদ্বাস্তুদের।

দুই

কিছু উদ্বাস্তু মানুষ তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে, অন্বেষণ করছিল একটা নিরাপদ আশ্রয়ের। তারা সন্ধান পেয়েছিল সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপের। সুন্দরবনের শুরু এখান থেকেই। সরকারি উদ্যোগে এখানে শুরু হয়েছিল নারকেল ও ঝাউ বাগানের কাজ। তার ফাঁকে ফাঁকে নৌকার ছইয়ের মতো তাবু ফেলেছে উদ্বাস্তুরা। ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশালের লোক এরা। সাগর নদী নিয়ে এদের জীবন। পাশের দ্বীপ থেকে কটা চালের ব্যবস্থা করতে পারলে নদী থেকে ওরা মাছ ধরে নেয়। জঙ্গলের কাঠ-কুড়িয়ে রান্না চাপায়। এই দ্বীপে পানীয় জল নেই পাশের দ্বীপ থেকে আনতে হয়। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ২ মে ১৯৭৮ আনন্দবাজার পত্রিকায় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নিয়ে সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের একটি রিপোর্ট বেরুল। তার শিরোনাম ছিল— 'ঘণ্টায় একশো উদ্বাস্তু চলে আসছেন সুন্দরবনের নয়া উপনিবেশে।' এই খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের টনক নড়ল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব অমিয় কুমার সেন উদ্বাস্তুদের অবস্থা সরজমিনে দেখতে এলেন। না, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা তার উদ্দেশ্য নয়। তিনি উদ্বাস্তুদের কাছে জানতে চাইলেন যদি দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে তাদের অভিযোগগুলির সমাধান হয় তাহলে তারা দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাবে কিনা? উত্তরটা তিনি সমস্বরেই পেলেন— না না না।

মরিচঝাঁপির স্কুল

এক বৃদ্ধা তো স্পষ্টতই বললেন--- 'আমাগো দণ্ডকারণ্যে না পাঠাইয়া ওই গাঙের জলে ভাসাইয়া দ্যান বাবু।' প্রায় ২৫ হাজার ছিন্নমূল সাজিয়ে তুলেছে নিজেদের নতুন বাসভূমি। উপকরণ সামান্য, যা প্রায় হাতের কাছের জঙ্গলেই পাওয়া যাচ্ছে, ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে তাঁদের স্বপ্নপুরী। সব এক মাপের কুঁড়ে ঘর, একটুখানি দাওয়া, তুলসীমঞ্চ, ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে দেশভাগের বলি হয়ে নিজের দেশ, ঘরবাড়ি, সাজানো সংসার ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। দণ্ডকারণ্যের পাষাণ প্রকৃতির শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে শ্যামল সবুজে ঘেরা বাঙ্গলার জল-মাটির প্রত্যন্ত সুন্দরবনে গড়ে তুলছেন নতুন দেশ। হারিয়ে যাওয়া স্বদেশের আকাঙ্ক্ষা ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা জনমানবহীন প্রত্যন্ত জঙ্গলেও যে বাসভূমি গড়া যায় তার প্রমাণ ছিল মরিচঝাঁপি। উদ্বাস্তুরা ৪০ বিঘে জমিতে ভেড়ি বানিয়ে চিংড়ির চাষ করছেন। জঙ্গলের কাঠ কেটে নৌকা তৈরি করছেন। কাঠের আসবাব, লোহার জিনিসপত্র বানাচ্ছেন। নিজেরা স্কুল বানিয়েছেন, রাস্তা বানিয়েছেন, নলকূপ বসিয়েছেন। মরিচঝাঁপি সুরক্ষিত বনাঞ্চল। সেহেতু জ্যোতি বসুর সরকার মনে করে ভারতীয় বনসংরক্ষণ আইনের ২৪ ধারা মরিচঝাঁপিতে প্রযোজ্য। ওই ধারা অনুযায়ী বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ বা অবস্থান করতে পারে না। ১৯৭৯ সালের ২৬ জানুয়ারি ওই আইন মোতাবেক জলপথে মরিচঝাঁপিতে যাতে কেউ খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল, ওষুধপত্রাদি পাঠাতে বা নিয়ে যেতে না পারে সে জন্য শ'খানেক লঞ্চ ও নৌকা দিয়ে পুলিশ মরিচঝাঁপি ঘিরে ফেলল।

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রায় তিন হাজার শিশু। ১৯৭৯ সালকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ 'শিশুবর্ষ' ঘোষণা করেছিল। বামফ্রন্ট সরকারের মরিচঝাঁপিতে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণার ফলে সেই তিন হাজার শিশুও প্রতিদিনের খাদ্য-পানীয় থেকে বঞ্চিত হলো। 'শিশুবর্ষে' মরিচঝাঁপির শিশুদের জন্য জনদরদি বামফ্রন্ট সরকারের এটাই ছিল উপহার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই নির্মম অনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। হাইকোর্ট ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দিল— 'পানীয় জল, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি, ওষুধপত্র ও চিকিৎসকদের অবাধ চলাচল করতে দিতে হবে মরিচঝাঁপিতে। মরিচঝাঁপি থেকে যাওয়া আসায় বাধা দেওয়া যাবে না।'

হাইকোর্টের আদেশ বেরুনোর পর কিছু ত্রাণসামগ্রী নিয়ে একদল সেচ্ছাসেবক মরিচঝাঁপিতে পৌঁছন। তাদের সঙ্গে কয়েকজন সাংবাদিকও ছিলেন। ত্রাণ-সামগ্রীর মধ্যে ছিল বেশ কয়েক বস্তা চাল। যা অল্প পরিমাণে অনেকগুলি পরিবারের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হয়েছিল। সেই চাল পেয়ে বহুদিনের অভুক্ত মানুষগুলির আনন্দের কথা অনবদ্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্তের লেখায় দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯)।

মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুরা কোনও অবৈধ কাজকর্ম করেনি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা একটু মাথা গোজার ঠাঁই বানিয়েছে। দারিদ্র্য ছিল, ক্ষুধা ছিল, আনন্দ ছিল, স্বপ্নও ছিল। কিন্তু সরকার এই সর্বহারা মানুষগুলোর আবেগকে বিন্দুমাত্র মূল্য দেয়নি। যে কোনও মূল্যে তাদের মরিচঝাঁপি থেকে তাড়াতে হবে, প্রয়োজনে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নির্দেশও দিয়ে রেখেছিল প্রশাসনকে। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, নদীর বিষাক্ত জল খেয়ে মরিচঝাঁপিতে পেটের রোগ ও কলেরা ছড়িয়েছে প্রতিদিন মরছে দু' পাঁচজন। ওষুধ নেই, অন্ন নেই, পানীয় নেই আছে শুধু কান্না ও হাহাকার।

জনদরদি সরকার এই অবরোধের সূচনা করেছিল ভারত ইতিহাসের এক পবিত্র দিন ২৬ জানুয়ারি। এই অবরোধেও মরিচঝাঁপির দারিদ্র্যজর্জরিত, অনাহার ক্লিষ্ট, একগুয়ে মানুষগুলোকে যখন কিছুতেই বাগে আনতে পারা যাচ্ছে না, তখন সরকার আরও কড়া পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৯ সালের মে মাসে বাম সরকার রীতিমতো যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে মরিচঝাঁপিতে। সহায়সম্বলহীন, নিরস্ত্র মানুষগুলোর উপর বর্বর আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে ৩০টি ছোটো বড়ো লঞ্চ এবং বিরাট এক সশস্ত্র বাহিনী তৈরি হয়। তাদের সঙ্গী হলো পার্শ্ববর্তী দ্বীপ এবং গ্রামের সিপিএম-এর ক্যাডার বাহিনী। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের যে কোনো মূল্যে উচ্ছেদ করতেই হবে। দ্বীপবাসীদের খাদ্য ও পানীয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পুলিশ ও ক্যাডাররা দ্বীপ ঘিরে ফেলে। কাঁদানে গ্যাস, গুলি চলে। কুটিরগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। জঙ্গলের কাঠ দিয়ে উদ্বাস্তুরা যাতায়াত এবং মাছ ধরার জন্য যে নৌকা বানিয়েছে সব নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। পানীয় জলের নলকূপগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। পালাতে গিয়ে বহু মানুষ গুলিবিদ্ধ হলো। স্বাধীন ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে যেন ৭১-এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনা ও স্থানীয় লুঠেরাদের তাণ্ডবের পুনরাবৃত্তি হলো। পাকসেনা, স্থানীয় রাজাকার ও লুঠেরাদের মতো মিলে মিশে এক হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের পুলিশ ও সিপিএমের ক্যাডার বাহিনী।

উদ্বাস্তুদের আর কোনো দেশ রইল না, আশ্রয় থাকল না। বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের উদ্বাস্তু উচ্ছেদ অভিযানে কতলোক যে মরেছিল তার কোনও হিসাব পাওয়া যায়নি। লাশগুলো সব নদীতে হাঙর কুমিরের পেটে গিয়েছিল। তবে একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে এই অভিযানে মোট ৪১২৮টি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতবড়ো একটা অন্যায় করেও সরকারের কোনও আমলা বা বামফ্রন্টের মন্ত্রীর শাস্তি হয়নি এমনকী কোনো মামলাও দায়ের হয়নি। কেন্দ্রের মোরারজী দেশাইয়ের সরকার কমিউনিস্টদের সমর্থন হারানোর ভয়ে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও মাথা ঘামানোর দরকার মনে করেনি। সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল এমন কিছু পরিবারকে আবার দণ্ডকারণ্যে ঠেলে পাঠাল সরকার। কিছু মানুষ পালিয়ে গিয়ে আবার ঘর বাধার চেষ্টা করেছেন হাসনাবাদ, বারাসত কিংবা বনগাঁর রেল লাইনের ধারে। এত বছর কেটে গেলেও সেই ভয়াবহ স্মৃতি হৃদয়ে আজও জেগে আছে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

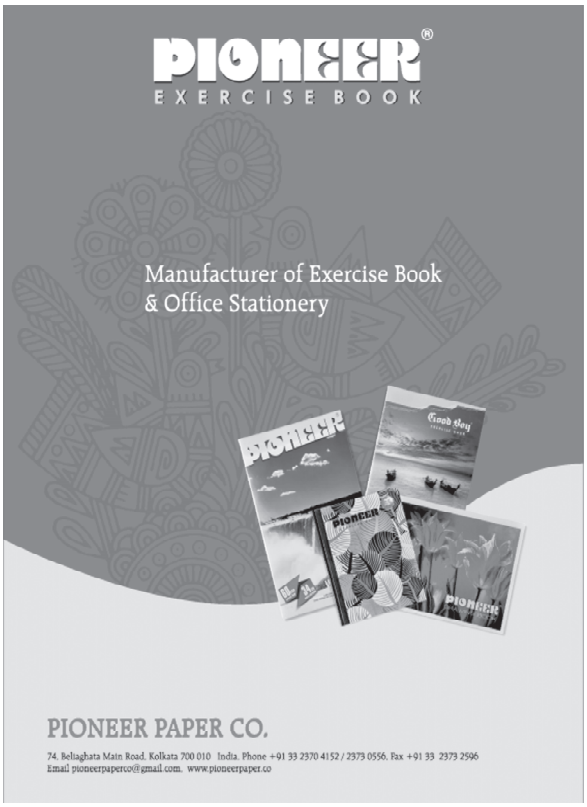

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

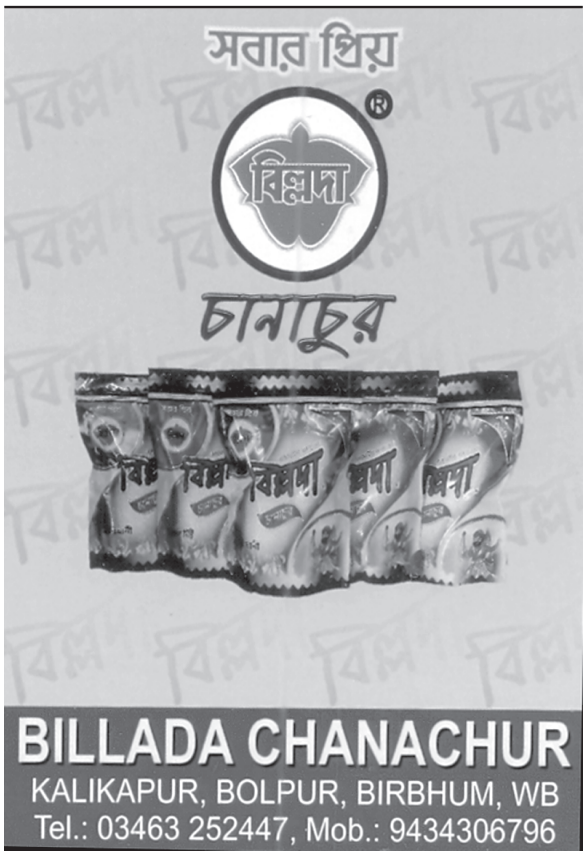

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষের জীবনবৃক্ষকে প্রাণদান করেছেন

সুকান্ত সরকার

ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের মুখপত্র 'ভারতীয় কিষান বার্তা'-র সম্পাদকীয় কলামে গত ১ ডিসেম্বর, ২০২০ জৈব কৃষিতে সবুজ সারের গুরুত্বের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার জীবনবোধের তুলনা করা হয়েছে। কোনো উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে মেশানোর ফলে পচে যে জৈবসার উৎপন্ন হয় তাকে সুবজ সার বা গ্রিন ম্যানিওর বলে।

এই পদ্ধতিতে প্রধানত শিম জাতীয় উদ্ভিদ এবং মূলত শন, ধইঞ্চা, মটরশুটি প্রভৃতি চাষ করা হয়। গাছগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যে সবুজ সার পাওয়া যায় তাতে মূলত নাইট্রোজেন, ফসফরাস, বিভিন্ন উপকারী ব্যাকটেরিয়া (যেমন অ্যাজাটো ব্যাকটেরিয়া) প্রভৃতি তৈরি হয় যা জমির পরবর্তী ফসল বা গাছের উত্তম খাদ্য। প্রতিবিঘা ধইঞ্চা চাষে দশ কেজি নাইট্রোজেন তৈরি হয়। আকন্দ গাছ থেকে প্রাপ্ত উপাদান উইপোকার উপদ্রব রোধ করে। নিমগাছজাত সবুজ সার রোগ-পোকার আক্রমণ কমিয়ে দেয়। এই ধরনের সবুজ সারের ব্যবহার ভারতবর্ষের কৃষকরা মহাভারতের যুগের আগে থেকে ব্যবহার করে আসছেন। মূলত ভারতবর্ষে লিগিউম শস্য অর্থাৎ ডালজাতীয় শস্য চাষ করার পর নন-লিগিউম শস্য যেমন ধান, পাট চাষ করা হয়।

প্রস্তুত সম্পাদকীয়টিতে সম্পাদক তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনা করতে গিয়ে সুন্দরভাবে ভগিনী নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী স্বামীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষের এক একটি জীবনবৃক্ষকে প্রাণদান করতে এলেন, পরিপুষ্ট করতে এলেন। সবুজসারের মতোই ভগিনী নিবেদিতা আত্ম বলিদান করলেন ভারতবর্ষের মানবজমিনে।

কবি মোহিতলাল মজুমদার ভগিনী নিবেদিতার জীবনবোধ প্রসঙ্গে বলেছেন— 'নিজেকেই ফুলে পুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়— অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য এমন ফসলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল যাহা বাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না, সে কেবল সার হইবার ফসল।' স্বামীজী সত্যই বলেছিলেন— 'Nivedita is the fairest flower of my work in gland।'

এটা সত্য যে ভগিনী নিবেদিতা নিজেকে নিবেদন করতেই এসেছিলেন ভারতবর্ষ নামক একটি বৃহৎ কুসুমোদ্যানে সমানে বিলিয়ে দিতে। তাই সবুজ সাররূপী নিবেদিতার গুণে এক একটি মানবরূপী ফুল ফুটে উঠল থরে বিথরে, তাদের প্রেরণা হয়ে দেখা দিলেন ভারতের মাটিতে, বিকাশের যাবতীয় পুষ্টিরস সরবরাহ করলেন আপন সৌকর্যে, অথচ নিজে থাকলেন একেবারেই নেপথ্যে, অবগুণ্ঠিত হয়ে, ঠিক যেমনটি উদ্ভিদ সবুজ সার প্রদান করে পরবর্তী অঙ্কুরিত উদ্ভিদকে বিলিয়ে দেয়।

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান
Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)
- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

বিবেকানন্দ স্মারক শিলার রূপকার

একনাথ রানাডে

আজ থেকে ১২৮ বছর আগের এক ২৪ ডিসেম্বর। ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসে আছেন ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী। সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছেন তিনি। রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির। অবশেষে এসেছেন ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে। কিছু দূরে ভারত মহাসাগরের বুকে দেখা যাচ্ছে এক বৃহৎ শিলাখণ্ড— একটি ডুবোপাহাড়ের শিখর। খুব ইচ্ছে হলো ওই পাথরখণ্ডটির উপর বসে ধ্যান করার। কিন্তু নৌকা ভাড়া দেবার আর্থিক সামর্থ্য নেই এই কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসীর। অগত্যা 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ' বলে ঝাঁপ দিলেন সমুদ্রে। হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীর আক্রমণের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে পৌষের প্রবল শীতে সমুদ্রের হাড় হিম করা ঠাণ্ডা ঢেউয়ের ছোবলকে তুচ্ছ করে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী।

সেখান থেকে অপলক চোখে চেয়ে রইলেন সম্মুখে শায়িত ভারতভূমির দিকে। একদা মহাজ্ঞানী আর্য ঋষিদের ভারতবর্ষ আজ ঘুমন্ত, তমসাচ্ছন্ন। তার সর্বাঙ্গে দাসত্বের শৃঙ্খল। ধ্যানমগ্ন হলেন সন্ন্যাসী। তাঁর ধ্যাননেত্রে ফুটে উঠল দেশজননী ভারতবর্ষের করুণ রূপ। ভগবান তথাগত বুদ্ধ যেমন করে বোধিবৃক্ষের নীচে ধ্যানমগ্ন হয়ে ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের জন্য খুঁজে এনেছিলেন অমরত্বের আলো, ঠিক তেমনই করে ভারতের এই শেষ শিলাখণ্ডে বিবেকানন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে উন্মোচিত হলো ভারতবর্ষের মহাজাগরণের সূচনা।

তারপর কেটে গেল অনেকগুলো বছর। পরাধীনতার নাগপাশ কাটিয়ে খণ্ডিত হয়ে ভারত স্বাধীন হলো। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত এই শিলাখণ্ডে তাঁর স্মৃতিমন্দির নির্মাণে সচেষ্ট হলো তাঁর বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় আদর্শে অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তারা। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের নির্দেশে একনাথ রানাডে কন্যাকুমারীতে ভারতের এই শেষ শিলাখণ্ডে স্বামীজীর স্মৃতিমন্দির নির্মাণে ব্রতী হলেন।

১৯৬২ সাল বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতি গঠিত হলে একনাথজী হলেন সাধারণ সম্পাদক। ততদিনে শিলাখণ্ডটি খ্রিস্টান পাদরিরা দখল করে নিয়েছে। তারা নাম দিয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্স রক। একনাথজী সারা দেশ ঘুরে ঘুরে জনমত সংগ্রহে নামলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৩২৩ জন সাংসদের সমর্থনসূচক স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সরকারের কাছ থেকে ওই শিলাখণ্ডে স্বামীজীর স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার অনুমোদন আদায় করলেন। তিনি কেন্দ্র ও মাদ্রাজ সরকারের কাছে দাবি জানালেন যে, গয়ার বোধিবৃক্ষ যেমন সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পবিত্র স্থল, স্বামীজীর আত্মসাক্ষাৎকারের স্থান হিসেবে এই শিলাখণ্ডেরও তেমন গুরুত্ব রয়েছে। তাই ওখানে জাতীয় স্মারক নির্মাণে সমিতিকে অনুমতি দেওয়া হোক। সরকারি অনুমোদনের পর একনাথজী শুরু করলেন স্বামীজীর স্মৃতিমন্দির নির্মাণের কাজ। ১৯৬৪ সালে স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো।

প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য একনাথজী স্বামীজীর ছবি-সহ কার্ড ছাপালেন, দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধ জানালেন মাত্র এক টাকার বিনিময়ে একটি করে কার্ড সংগ্রহ করতে। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সারা দেশের মানুষ ও রাজ্য সরকারগুলিও এগিয়ে এল। অবশেষে ১৯৭০ সালে বিবেকানন্দ শিলায় স্বামীজীর স্মৃতিমন্দির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলো। এর দারোদ্ঘাটন করলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি। উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী। স্মৃতিমন্দির স্থাপন করেই কর্মযোগী একনাথজী ক্ষান্ত হলেন না। কারণ তিনি যে স্বামীজীর ভাবনাকে রাষ্ট্রীয় চেতনার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন, সেই স্বামীজী তো মন্দিরে পূজা গ্রহণকারী দেবতা শুধু নন, তিনি যে ভারতাত্মা, মূর্ত ভারতবর্ষ। তাই অসহায়, দুঃখী ভারতবাসীর সেবাকেই তিনি বিবেকানন্দ পূজা হিসেবে গ্রহণ করলেন। আর এই ভাবনা থেকে এই স্মৃতিমন্দিরকে কেন্দ্র করে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত একদল তরুণ-তরুণীকে সংগঠিত করলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার দু'বছর পর তিনি গঠন করলেন বিবেকানন্দ কেন্দ্র। উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে সেবাধর্মের বিস্তার।

১৯৮২ সালে লোকান্তরিত হয়েছেন একনাথজী। কিন্তু আজও ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে নির্মিত স্মৃতিমন্দিরকে কেন্দ্র করে স্বামীজীর রাষ্ট্রীয় চেতনা ও সেবার আদর্শ অনুরণিত হয়ে চলেছে।

তাপস ঘোষ

ভারতের পথে পথে

জ্বালামুখী

হিমাচলের কাংড়া থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে জ্বালামুখী। মন্দির নিয়েই শহর। ৬১০ মিটার উচ্চে জ্বালাজী মন্দির। বিষ্ণুচক্রে টুকরো হয়ে সতীর জিহ্বার পতন এই কালীধর পাহাড়ে। ৫১ সতীপীঠের অন্যতম জ্বালামুখী। একশো বছর আগে কোনো এক রাখাল প্রথম দেখতে পায় এখানকার জ্বলন্ত শিখা। এখানে মন্দির নির্মাণ করেন কটোক রাজা ভূমিচন্দ্র। আজও সতীর জিহ্বা মন্দিরের গহ্বরে নীলাভ শিখায় জ্বলছে। এখানে দেবীর কোনো মূর্তি নেই। অনির্বাণ শিখাকেই দেবীর প্রতিভূ মনে করা হয়। রয়েছে দুটি ঝরনা। এপ্রিল ও অক্টোবরে এখানে নবরাত্রির মেলা বসে। দূরদূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসেন। মূল মন্দিরে রয়েছে নানা দেব-দেবীর মূর্তি। দেবী মন্দিরের উপরের পাহাড়ে রয়েছে বাবা গোরক্ষনাথের মন্দির। ৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে রঘুনাথজীর মন্দির।

জানো কি?

- এক কাপ কফিতে একশোরও বেশি রাসায়নিক পদার্থ আছে।
- গোরু সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে পারে কিন্তু নামতে পারে না।।
- এক ঘণ্টা চুইংগাম চিবোলে শরীরের ৩০ ক্যালরি তাপ ক্ষয় হয়।
- চোখ খোলা রেখে ব্যাং কিছু গিলতে পারে না।
- হাতি একমাত্র স্তন্যপায়ী, যারা লাফ দিতে পারে না।
- একজন মানুষ বছরে ৪২ লক্ষ বার চোখের পলক ফেলে।
- এক পাউন্ড তুলা থেকে ৩৩ হাজার মাইল সুতা তৈরি সম্ভব।

ভালো কথা

পশুপ্রেম

করোনার কারণে যখন লকডাউন শুরু হলো তখন প্রথম কদিন ভালোই লাগছিল। কয়েকদিন পর বোঝা গেল গরিব মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার কুকুরগুলোও না খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। সরকারি ব্যবস্থা শুরু হওয়ার আগে পাড়ার দাদারা গরিবদের বাড়িতে বাড়িতে চাল-ডাল-আলু পৌঁছে দিতে শুরু করে। রাস্তার কুকুরগুলির কথা তাদের মনে পড়েনি। আমাদের পাড়ার ফুটপাতে থাকা সুকুমার, শম্ভু, মঙ্গল, তাদের সঙ্গে গুলশন দাস কুকুরগুলির কষ্ট বুঝতে পেরে প্রতিদিন চার কিলো চালের ভাত রান্না করে ভ্যানে করে ঘুরে ঘুরেপাড়ার রাস্তায় থাকা কুকুরগুলিকে খাওয়ানোর কাজ শুরু করে। তাদের এই পশুপ্রেম আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছে।

রাহুল দাস, একাদশ শ্রেণী, কালী সিংহী পার্ক, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

শীতের খেলা

তীর্থঙ্কর ঘোষ, নবম শ্রেণী, কালিয়াগঞ্জ কলেজ পাড়া, উঃ দিঃ

সাতদিন কনকনে
সাতদিন গরম,
সাতদিন মেঘ মেঘ
সাতদিন নরম।
গরমেতে টেকা দায়
ঘেমে সব একশা।
পাখা চলে বনবন
গরমের ভ্যাপসা।

শীতবুড়ির একি খেলা
ভেবে আমি পাইনি,
শীতের এই খেলায় এবার
কোথাও তো যাইনি।
শীতকালে কত মজা
এবারে তা হলো না,
শীতের খেলায় ভালোয় হলো
দাঁড়িয়ে যে করোনা!

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ১।।

শ্রীগুরুজী

সদাশিব ও লক্ষ্মী মোট ন'টি পুত্র-কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মাধব ছাড়া কেউ জীবিত ছিল না। ১৯০৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, ভোরবেলায় জন্ম হলো মাধবের।

ভোঁসলেদের প্রাসাদে বিউগিল বাজছে। ঈশ্বর করুন, আমাদের মাধবের খ্যাতি যেন বিউগলের আওয়াজের মতো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ঠিক এভাবেই লক্ষ্মীর তিন বোন নবজাতককে অভ্যর্থনা জানালেন

নবজাতকের নাম রাখা হলো মাধবরাও। ডাকনাম মধু। ছোট্ট মধুর হাত ধরে সৌভাগ্যলক্ষ্মী পা রাখলেন গোলওয়াকর পরিবারে।

মধুর মামা বালকৃষ্ণ রায়করের অবস্থার উন্নতি হলো। ভাগ্য ফিরল সদাশিবরাওয়েরও। মধুর জন্মের পর তিনি শিক্ষকতার সুযোগ পেলেন। পোস্ট অফিসের চাকরি আর করলেন না।

ক্রমশ

ভারতের সিরিজ জয় সম্মিলিত চেষ্টার ফসল

অভিজিৎ ঘোষ

ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ ভারতীয়দের মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। যাঁরা এই সিরিজ দেখেছেন, মনশ্চক্ষু দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এই খেলা, তাঁরা হয়তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এটি ভুলবেন না। এটা শুধু রান করার বা উইকেট নেওয়ার সিরিজ ছিল না। কোনো স্কোর বোর্ডই মাঠে হয়ে যাওয়া টেস্ট খেলার নাটকীয় মুহূর্তগুলো তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট নয়। ভারতের জন্য শেষ মুহূর্তের ২-১ ফলাফল 'লগন' ছায়াছবির চেয়েও বেশি নাটকীয় ছিল, ভারতের ক্রিকেটের টেস্ট সিরিজের ইতিহাসের এ এক সেরা বিজয়।

ভারতীয় দল কয়েকমাস ধরেই এক আবদ্ধতার অনুভূতির বুদবুদের মধ্যে ছিল। প্রথম টেস্টের পরেই ভারতের প্রধান ব্যাটস্‌ম্যান বিরাট কোহলি পিতৃত্বকালীন ছুটিতে চলে গেলেন। সর্বকালীন কম ৩৬ রানে পুরো দল শেষ হয়ে গেল। জাতপাত নিয়ে বিভিন্ন বর্ণবিদ্বেষমূলক আক্রমণে, অশ্রাব্য গালিগালাজে, ব্যঙ্গবিদ্রূপে এবং চোটের সমস্যায় ভারতীয় দল ছিল বিধ্বস্ত। ভারতের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন বোলারের কেউই— বুমরাহ, শামী, যাদব, অশ্বিন ও জাদেজা— ব্রিসবেনের শেষ খেলায় ছিলেন না।

এগারো জন ফিট খেলোয়াড়কে মাঠে নামানোর মতো অবস্থায় ভারত ছিল না। চারটি টেস্ট মিলিয়ে ২০ জন খেলোয়াড়কে ভারত মাঠে নামিয়েছে, যা একটি রেকর্ড। গাব্বা টেস্টের আগে বিকল্প বোলাররা মোট ১৩টি উইকেট নিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার চারজন ব্যাটসম্যান— কামিন্স, হ্যাজেলউড, স্টার্ক ও লিয়ন ১০১৩ রান করেছিলেন। ১৯৮৮ সালের পর গাব্বায় অস্ট্রেলিয়া কোনো টেস্ট খেলায় হারেনি।

দুর্দশা নানারকম প্রশ্নের জন্ম দেয়। দুঃসময় পরীক্ষা নেয় আপনার ব্যক্তিত্বের, বিব্রত করে আপনার বিশ্বাসকে। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতেও অজিঙ্ক রাহানের ছেলেরা অনুপ্রেরণা পেয়েছে। যখনই দল ভাটায় পড়েছে, কেউ না কেউ সেখানে গতি এনে দিয়েছে। এই দলটি কোহলির কথামতো 'পজিটিভ' নতুন ভারতই শুধু ছিল না, এটি পুরানো ও নতুনের সংমিশ্রণ ছিল।

পূজারার অপ্রতিহত জেদ বহুকাল আগের মহিন্দর অমরনাথের কথা মনে করিয়ে দেয়। একজন হেভিওয়েট বক্সার শরীরে যা আঘাত পায়, তার থেকেও বেশি আঘাত সহ্য করে পূজারা ১৩৬৮ মিনিট ব্যাট করেছিল। অমরনাথ, যাকে অপ্রতিরোধ্য পর্বত বলা হতো, পূজারা যেন সেই দৃষ্টান্তই স্থাপন করল, সিডনি ও ব্রিসবেনে ভারতের যোগ্য জবাবের জন্য অপরিহার্য ছিল পূজারার ধৈর্য ও নিখুঁত টেকনিক। এই সিরিজ ভারতীয় দলকে আদুরে শিশু থেকে যেন শক্তিশালী মানুষে পরিণত করল। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলটি তার লড়াকু মেজাজের জন্য পরিচিত, হার না মানার মানসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়াকে অস্ট্রেলিয়ার ভাষায় জবাব দিয়েছে।

এটি ছিল একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা, ক্যাপ্টেন রাহানের ম্যাচ-জেতানো ১১২ রানের মেলবোর্নের ইনিংসটি অনবদ্য। কিন্তু এখানে অন্য এক রাহানের পরিচয় পেল ভারতীয় ক্রিকেট, যিনি সুন্দরভাবে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছেন, তুখোড়ভাবে ফিল্ডিং সাজাচ্ছেন, স্বল্প সংখ্যক ব্যবহারযোগ্য খেলোয়াড়দের সঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে গোটা দলে একটি ঐক্যতান রচিত হয়েছিল। হনুমা বিহারি আই-পি-এলের নিলামকারীদের উন্মত্ত করে তুলেছিল। তৃতীয় টেস্টে হ্যামস্ট্রিং-এ চোট নিয়েও হনুমা অবিশ্বাস্য রকমের ব্যাট করল, যন্ত্রণাকাতর হয়েও অশ্বিন নিজেকে একজন ব্যাটসম্যান হিসাবে পুনরায় আবিষ্কার করল। তাঁরা দুজনেই একটি ম্যাচ-বাঁচানোর পার্টনারশিপ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের দুজনের কেউই পরের টেস্টে খেলেননি।

গাব্বায় ব্যাটসম্যানদের মতো বোলারদেরও একই অবস্থা। গাব্বার ভারতীয়দের বোলিং আক্রমণ স্বাধীনতার পর থেকে সব থেকে অনভিজ্ঞ ও দুর্বল ছিল। তবুও তারা বিরোধীদের দুবার আউট করেছিল। ঠাকুর ৭টি এবং মহম্মদ সিরাজ ৬টি উইকেট নিয়েছিল, যার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি উইকেট ছিল। বর্ডার-গাভাস্কর ট্রফিতে ভারতের টিকে থাকার মূল কাণ্ডারি এই তিন জন। এই সিরিজ সম্মিলিত প্রচেষ্টার জয়।

এই সিরিজ শুরু হয়েছিল 'সব থেকে খারাপ সময়' দিয়ে এবং শেষ হলো সব থেকে ভালো সময় দিয়ে। ভ্যাকসিন চলে এসেছে। সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়াকে তাদের মাটিতে হারানো গেছে। ২০২১ সালে আর আরো ভালো হবে।

(লেখক টাইমস অব ইন্ডিয়ার অ্যাসোসিয়েট এডিটর)

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পূর্বতন প্রান্ত সঙ্ঘচালক হেমন্ত

কুমার বর্মা গত ২০ জানুয়ারি নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

সত্যি কথা বলছেন বলে অর্ণব অনেকের চক্ষুশূল

ড. রমা ব্যানার্জি

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু অগণতান্ত্রিক, অমানবিক ও সংবিধান বহির্ভূত ঘটনা যা মহারাষ্ট্রে আমরা মিডিয়া মারফত প্রত্যক্ষ করলাম, তা নিঃসন্দেহে যে কোনও সভ্যদেশের পক্ষে লজ্জাজনক। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের একটি গণমাধ্যম, যার কাজ জনগণকে দেশের ও বিদেশের খবর জানানো। যেহেতু গণতন্ত্রে জনগণের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, জনগণকে দেশের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করা, মানুষের বিভিন্ন সমস্যাকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করা, জনমত গঠন করা মিডিয়ার কাজ। সরকারের ভ্রষ্টাচারের সমালোচনা করা মিডিয়ার সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে। কোনও সরকারই সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয়। এই জরুরি কথাটাই মহারাষ্ট্র সরকার সম্ভবত ভুলে গেছে, তাদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ, একটি বিশেষ মিডিয়া চ্যানেলের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচায়ক।

২০২০ সালে অর্থাৎ গত বছর ষোলই এপ্রিল জুনা আখড়ার দুজন সাধু— মহারাজ কল্পবৃক্ষগিরি (৭০), সুশীলগিরি (৩৫) এবং তাঁদের গাড়ির চালক নীলেশ তেলগাড়ে (৩০) তাঁদের গুরুদেব মোহন্ত রামগিরির শেষযাত্রায় যোগ দিতে সুরাট যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে তাঁদের গাড়ি আটকায় কয়েক হাজার সশস্ত্র লোক। গাড়ির আরোহীদের টেনে হিঁচড়ে বের করা হয়। অকুস্থলে উপস্থিত ছিল পনেরোজন সশস্ত্র পুলিশ। তাদের চোখের সামনে তিনজন নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে ওই মারকুটে জনতা কুঠার ও লাঠির দ্বারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। বৃদ্ধ সাধুটি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের হাত জাপটে ধরে থাকে, হত্যাকারীদের বাধা দেবার কোনও চেষ্টা তো করেইনি, উপরন্তু যে বৃদ্ধ সাধুটি পুলিশের হাত ধরেছিল প্রাণ রক্ষার তাগিদে, পুলিশ তাকে ধাক্কা মেরে গুন্ডাদের মধ্যে ঠেলে দেয়। এই ভয়াবহ দৃশ্য

টেলিভিশনে সারাদেশ দেখেছে। সেদিন মানুষ জানল রক্ষক কীভাবে ভক্ষকের রূপ ধারণ করতে পারে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল কোনও মোমবাতি মিছিল করেনি, কেউ রাষ্ট্রের দেওয়া পুরস্কার ফেরত দেয়নি, মহারাষ্ট্র সরকার অর্থাৎ শিবসেনা, কংগ্রেস ও এনসিপি দলের তরফ থেকে কেউ এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে বিবৃতি দেয়নি। ২০১৫ সালে উত্তর প্রদেশের দাদরিতে আখলাক নামে এক ব্যক্তিকে কিছু দুষ্কৃতকারী পিটিয়ে মারে। দেশের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ওই ঘটনার নিন্দা করেছিলেন, ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক ও নিন্দার্হ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সংবেদনশীল মানুষ দোষীদের কঠিন শাস্তি দাবি করেছিল। ওই দুর্বৃত্তের দল জেলবন্দি হয়, বিচারে শাস্তি পায়।

বলিউডের শাবানা আজমি, নাসিরুদ্দিন শাহ, জাভেদ আখতার ইত্যাদিরা আখলাকের মৃত্যুর জন্য শুধু শোকপ্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি, তারা ভারতকে 'লিন্‌চিস্তান' আখ্যা দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, পালঘরের তিনজন নিরীহ মানুষের নৃশংস হত্যার ক্ষেত্রে কিন্তু টুঁ শব্দ করেননি এরা। নিহত মানুষদের মধ্যে দুজন ছিলেন গেরুয়া পরিহিত সন্ন্যাসী। সেই কারণেই কি তাঁদের পিটিয়ে মারাটা কোনও ব্যাপারই নয়? সখ্যাগুরু হিন্দুর দেশে গেরুয়া পরাটা কি অপরাধ? না কি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক? মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের পিতা বালাসাহেব ঠাকরে ছিলেন হিন্দুসমাজের রক্ষাকর্তা একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা এবং শিবসেনা নামক দলটির প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু তারই সুপুত্র মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার লোভে হিন্দুত্ব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে হিন্দুবিদ্বেষী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে গদি দখল করে। তাই পালঘরের নৃশংস সাধু হত্যার জন্য আজও কারও শাস্তি হয়নি, উদ্ধব ঠাকরে বা সোনিয়া গান্ধী বা শরদ পাওয়ার কেউই ওই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে কোনও বিবৃতি দেয়নি। মিডিয়াও এই ঘটনা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি, একমাত্র ব্যতিক্রম রিপাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের অর্ণব গোস্বামী।

পালঘরের হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে অর্ণব লাগাতার সোচ্চার হয়েছেন, ঘটনার ভিডিয়ো দেখিয়েছেন নিয়মিত। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন করেছেন। তাদের এই ব্যাপারে অদ্ভুত নীরবতার কারণ জানতে চেয়েছেন, কোনও সদুত্তর পাননি। তবে সারা দেশের সন্তসমাজ অর্ণবকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, তাঁকে দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন, তারা মনে করেন ওই নৃশংস সাধুহত্যার বিচার একদিন অবশ্যই হবে, দোষী পুলিশবাহিনী ও হত্যাকারীরা শাস্তি পাবে অর্ণবের একক উদ্যোগে। একমাত্র তিনিই বলেছেন যে ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত, তা নাহলে দেশব্যাপী কোভিড মহামারীর জন্য লক ডাউন চলাকালীন হাজার হাজার গুন্ডা সমবেত হলো কীভাবে?

এবার আসছি বলিউডের উঠতি সুপারস্টার সুশান্ত সিংহ রাজপুতের

অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রসঙ্গে। গত বছর (২০২০) চোদ্দই জুন তাকে তাঁর বান্দ্রার ফ্লাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, ওইদিন সকালে তাঁকে নাকি গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় সিলিং ফ্যানে থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। সিদ্ধার্থ পিঠানী নামে তাঁর এক বন্ধু যাকে তিনি তাঁর ফ্ল্যাটে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই নাকি কিচেন নাইফের সাহায্যে গলার ফাঁস কেটে সুশান্তের দেহ নামায়। তারপর তাঁর মরদেহ কুপার হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় পোস্ট মর্টেমের জন্য। সেখানে তিনজন ডাক্তার রাত্রিবেলা পোস্ট মর্টেম করে রিপোর্ট দেন। ওই রিপোর্টে মৃত্যুর সময় (আনুমানিক) উল্লেখ করা হয়নি, যেখানে সময় উল্লেখ করা আইনত বাধ্যতামূলক। কুপার হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়ার আগে কোনও ডাক্তারকে সুশান্তের ফ্ল্যাটে বসবাসকারী কর্মচারীরা বা বন্ধুরা ডাকেনি। সুশান্ত সত্যিই মৃত কি না সেটা কোনও ডাক্তারকে ডেকে পরীক্ষা করানো হয়নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, মহারাষ্ট্রের পুলিশ মন্ত্রী অনিল দেশমুখ ও তার পুলিশ প্রথম দিনই ঘোষণা করে দেয় যে সুশান্ত সুইসাইড করেছে, যদিও কোনও সুইসাইড নোট খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ কোনও এফআইআরও করেনি যেটা আইন অনুযায়ী তাদের প্রথমেই করার কথা পোস্টমর্টেম রাত্রে করা হয়েছে, কোনও ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়নি। ডেডবডি নিতে দুটি অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল, একটি বডি নিতে দুটি অ্যাম্বুলেন্স কেন, সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

সুশান্ত সিংহ রাজপুত ছিলেন একজন শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, যাঁর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি ছিল, তিনি ফিজিক্সে ন্যাশানাল অলিমপ্যাড জিতেছিলেন, এগারোটি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সফল্য পেয়েছিলেন যার মধ্যে ধানবাদের আইএসএম-ও ছিল। অভিনয়ের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। তাই বিহার থেকে বলিউডে পা রাখেন অভিনেতা হবার জন্য। তাঁর পরিবার অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতা ও বোনেরা জানিয়েছেন যে সুশান্ত সুইসাইড করতেই পারে না, তাঁর নাসায় যাবার পরিকল্পনা ছিল, মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের জগৎ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ তাঁর ছোটোবেলা থেকেই ছিল। মুম্বাইতে তাঁর ফ্ল্যাটে জানলার সামনে তিনি একটি বড়োসড়ো টেলিস্কোপ বসিয়েছিলেন আকাশের দিকে মুখ করে। তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ডায়েরির পাতায় পাতায় বর্ণিত ছিল। তাঁর ডায়েরিটি পাতা ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া যায়।

সুশান্তের মৃত্যুর পর বলিউডের নামজাদা লোকজনরা কেউ কোনও শোকপ্রকাশ করেনি। এটা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। অথচ এদের মধ্যে অনেকেই এবং মিডিয়ার একটি বড়ো অংশ সুশান্তকে মানসিক ভারসাম্যহীন, নেশাগ্রস্ত এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি চরিত্র হিসেবে বর্ণনা করতে শুরু করে। এরা এতটাই নিম্নরুচিসম্পন্ন যে একজন মৃত মানুষের বিরুদ্ধে যে মানুষটি প্রতিবাদ করার অবস্থায় নেই, লাগাতার অপপ্রচার চালিয়ে গেছে।

অর্ণব গোস্বামী একমাত্র সাংবাদিক যিনি সুশান্তের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুটাকে 'সুইসাইড' বলে মেনে নিতে পারেননি। তিনি তাঁর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম শুরু করেন এবং জানতে পারেন যে ৮ জুন সুশান্তের প্রাক্তন ম্যানেজার দিশা সামিয়ান চোদ্দতলা থেকে নীচে পড়ে মারা যায় এবং পুলিশ কোনও তদন্ত না করেই কেসটা 'সুইসাইড' বলে ধামাচাপা দিয়ে দেয়। অর্ণব জানতে পেরেছিলেন যে দিশাকে ওইদিন মহারাষ্ট্রের এক অত্যন্ত উচ্চপদে আসীন মন্ত্রীপুত্রের ফার্ম হাউসে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে সে সেখানে যায়, সেখান থেকে তাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। বাড়ি ফেরার পথে ফোনে সুশান্তকে সে তার নির্যাতিত হবার কথা জানায়। স্বাভাবিক ভাবেই সুশান্ত আপসেট হয়ে পড়েন। তারপর যখন সিদ্ধার্থ পিঠারীর কাছ থেকে তিনি দিশার মৃত্যুর খবর পান, তিনি ভেঙে পড়েন। পরে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ দু-একজনকে জানান যে তিনি সমগ্র বিষয়টি প্রেসকে জানাবেন। এদের মধ্যে তাঁর বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীও ছিল। সূত্র ফারফত জানা যায় যে এই খবরটি মন্ত্রীপুত্রের কাছেও পৌঁছে যায় যে ছিল লাটের গুরু। তাকে আবার অনেকে বেবী লেঙ্গুয়িন বলেও ডাকে। ১৩ জুন রাত্রে সে তার দলবল নিয়ে সুশান্তের ফ্ল্যাটে যায় তার নিজের জন্মদিনের পার্টি করবে বলে। তারা বিনা খবরেই এসে হাজির হয়েছিল। পরদিন সকালে সুশান্তকে মৃত অবস্থায় (অথবা ঝুলন্ত অবস্থায়) পাওয়া যায়।

মিডিয়া জগৎ থেকে একমাত্র অর্ণব গোস্বামী ওই দুটি মৃত্যু যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, সে কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে থাকেন। মহারাষ্ট্র সরকার এবং তাদের তল্পিবাহক মুম্বই পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংহ যে ওই দুটি মৃত্যুরহস্য ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেটা অর্ণবই পাবলিকের গোচরে আনেন। সুশান্তের অকালমৃত্যুর পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে তারই সত্যান্বেষণ করতে গিয়ে অর্ণব বলিউডের নিষিদ্ধ ড্রাগ মাফিয়ার বিষয়ে জানতে পারেন এবং আমাদের তাঁর চ্যানেল মারফত জানান। অনেক বলিউডি রাঘববোয়াল এবং মহারাষ্ট্র সরকারের প্রভাবশালী কিছু মন্ত্রীসান্ত্রী ড্রাগচক্রে যুক্ত আমরা জানতে পারি। এদের অনেকেরই বহির্ভারতের ড্রাগ মাফিয়াদের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে। এদের বেপরোয়া অবৈধ কার্যকলাপ সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করানোর জন্য অর্ণবকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যাদের হয়ে বলার কেউ নেই, তাদের কথা বলার জন্য তাঁকে যে মাশুল দিতে হলো এবং এখনও হচ্ছে, সেটা ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে লেখা থাকবে।

পরমবীর সিংহ ২০২০ সালের জানান যে রিপাবলিক টিভি টিআরপি (টেলিভিশন রেটিং পয়েন্টস) ম্যানিপুলেট করছে সেটা একটা অবৈধ কাজ। যেসব বাড়িতে ব্যারোমিটার লাগানো হয়, সেইসব বাড়ির বাসিন্দাদের অর্ণবের চ্যানেল চারশো টাকা করে দেয় যাতে তারা রিপাবলিক চ্যানেল দেখে অথবা না দেখলেও চালু রাখে, এমনকী যখন তারা বাড়িতে থাকে না, তখনো যেন রিপাবলিক চ্যানেল চালু রেখে বেরোয়।

BAKC (Broadcast Audience Research Council) প্রতি সপ্তাহে রেটিং পয়েন্ট বের করে, দু' হাজার ব্যারোমিটার মুম্বাইয়ের বিভিন্ন বাড়িতে বসানো আছে। এই ব্যারোমিটারগুলির থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ BAKC 'হানসা' নামে একটি সংস্থাকে দিয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, যে এফআইআর রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশ কমিশনার প্রেস কনফারেন্স করলেন, সেই রিপোর্টের কোথাও রিপাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের নামও ছিল না, সেখানে টিআরপি ম্যানিপুলেটর হিসেবে নাম রয়েছে 'ইন্ডিয়া টু ডে'র। 'ইন্ডিয়া টু ডে'র নামই তিনি উচ্চারণ করলেন না একবারের জন্যও, অথচ যে চ্যানেলের নামই নেই, সেটিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। হয় পরমবীর সিংহ রিপোর্টটি পড়ে দেখেননি। অথবা নিছক রিপাবলিক মিডিয়াকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে তার নাম করা হলো। অর্ণব এই মিথ্যা বদনাম সহ্য করেননি, 'হানসার' রিপোর্ট পরের দিনই জোগাড় করে টিভি দর্শকের সামনে পেশ করেন, সেখানে আমরা পরিষ্কার দেখলাম 'ইন্ডিয়া টু ডে'র নাম জ্বলজ্বল করছে, রিপাবলিকের কোনও উল্লেখই নেই। অর্ণবকে BARC সংস্থাও দুটি ই-মেল মারফত জানায় যে তাঁর চ্যানেলের বিরুদ্ধে তাদের কোনও অভিযোগ নেই।

অর্ণবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বহুদূর পর্যন্ত বিছিয়ে দেওয়া হলো। এবার পুলিশ তার সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসেব চেয়ে পাঠানো যদিও এটা পুলিশের কাজ নয়। তাঁর অফিসের যাবতীয় জিনিসপত্রের দাম, কোথা থেকে কেনা, কোন জিনিসটি মাসে কতটা লাগে, ওগুলির জন্য টেন্ডার ডাকা হয় কিনা, এমনকী (বলতে লজ্জা হয়) টয়লেট পেপার বাবদ মাসে কত খরচ হয়, কটালাসে, সমস্ত ডিটেল চেয়ে পাঠানো হলো, অর্ণবের অ্যাকাউন্ট্যান্ট অগুনতি ফাইল সমেত থানায় হাজিরা দিল। যতবার ডেকেছে, ততবার।

TRP scam বানিয়ে পুলিশ কমিশনারের মিথ্যাচার যখন মানুষ জেনে ফেলল, তখন তিনি আরও মরিয়া হয়ে উঠলেন, অবশ্য কী আর করবেন? তিনি তো His Master's Voice মাত্র। পালঘরের সাধুহত্যার প্রতিবাদ করা? বিচার চাওয়া? সাহস তো কম না, তার ওপর আবার বেবী পেঙ্গুইনের কেলোর কীর্তি ফাঁস করার চেষ্টা? এত বড়ো স্পর্ধা? দাঁড়া, তোর মজা দেখাচ্ছি। এরপর শুরু হলো 'অর্ণব হঠাও' অভিযান।

রিপোর্টার অনুজ কুমার, তার সঙ্গী ভিডিয়ো জার্নালিস্ট যশপালজিৎ সিংহ ও তাঁদের ট্যাক্সি চালককে পুলিশ জোরজবরদস্তি করে জেলে পুরে দিল, তাদের অপরাধ ছিল মহারাষ্ট্রের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ফার্ম হাউসের গেটের বাইরে তারা দাঁড়িয়েছিল। অনুজকে তার আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি, এমনকী ফোনে তার মার সঙ্গেও পুলিশ কথা বলতে দেয়নি। ছয়দিন তাদের জেলে আটক রাখা হয়, তাদেরকে নির্যাতন করা হয়, সমানে জানতে চাওয়া হয় তাদের খবরগুলির সোর্স কী।

এরপর চলতে থাকে লাগাতার হেনস্থা অর্ণব ও তাঁর সহকর্মীদেরকে রিপাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের এক হাজার কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশকেই মুম্বই পুলিশ চেনে না, জানে না, কিন্তু এদের অপরাধ এরা রিপাবলিকে কাজ করে।

রিপাবলিকের নিউজরুমের প্রতিটি স্টাফের পাসওয়ার্ড এবং নিউজরুমের নিজস্ব পাসওয়ার্ড পুলিশ চেয়ে পাঠায়। এই সংস্থার Executive Editor নিরঞ্জনকে চারবার পুলিশ ডেকে পাঠায় থানায়, সে নির্দেশ মেনে চারবারই হাজিরা দেয়। চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার এস সুন্দরমকে ডেকে পাঠিয়ে সমানে জেরা করে, সারাদিন বসিয়ে রাখার পর।

TRP Scam-এ অর্ণবকে ফাঁসাতে না পেরে রাগের জ্বালায় পরমবীর সিংহ সংস্থার Distribution Head ঘনশ্যাম সিংহকে গ্রেপ্তার করে। তাকে সকালবেলা তার বাড়ি থেকে তুলে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সংস্থার Assistant Vice President (Distribution), যতবার পুলিশ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে, তিনি কাগজপত্র সমেত গেছেন, তা সত্ত্বেও মিথ্যা কেসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, ১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তাঁকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করে কুখ্যাত তালোজা জেলে রাখা হয়। জেলের ভিতর তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়, চাক্কি বেল্ট দিয়ে তাঁকে মারা হয় যাতে তাঁকে দিয়ে কিছু মিথ্যা কবুল করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু অর্ণবের সহকর্মীরা তাঁর মতোই নির্ভীক, কষ্টসহিষ্ণু এবং লড়াকু মনোভাবাপন্ন ঘনশ্যাম শত অত্যাচারেও পরমবীরের প্রত্যাশা পূরণ করেননি, মুখ বুজে সব নির্যাতন সহ্য করেছেন।

মহারাষ্ট্র সরকার রিপাবলিক মিডিয়া টেনওয়ার্কের মহিলা কর্মীদেরও হেনস্থা করতে ছাড়েনি। চিফ অপারেটিং অফিসার প্রিয়া মুখ্যার্জিকে বার বার থানায় ডেকে পাঠানো হয়। আউটপুট এডিটর সাগরিকা মিত্রকে সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট এডিটর শিবানী গুপ্তাকে থানায় ডেকে পাঠিয়ে জেরা করা হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সিনিয়র এক্সকিউটিভ এডিটর অভিষেক কাপুর, ডেপুটি এডিটর শাওন সেন, কাউকে ছাড়েনি পরমবীর সিংহ। ইতিপূর্বে পালঘরের সাধুহত্যা নিয়ে তদন্তের দাবি করার জন্য স্বয়ং অর্ণবকে থানায় দু'বার ডেকে কুড়ি ঘণ্টা ধরে জেরা করা হয়।

নিরজন নারায়ণ স্বামীকে ২০ ঘণ্টা, অভিষেককে সাত ঘণ্টা সিএফও সুন্দরমকে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা (বার বার ডেকে) সিইও বিকাশ খানচান্দালীকে চেলে পোরর ফলে সাত ঘণ্টা, সিওও হর্ষ ভাণ্ডারীকে আট ঘণ্টা, ঘনশ্যামকে পঁচিশ ঘণ্টা থানায় বার বার ডেকে জেরায় জেরায় জেরবার করা হয়। পরে জেলে পোরা হয়।

কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে মহারাষ্ট্র সরকার ব্যাপক সংক্রমণ আটকাবার চেষ্টা না করে অর্ণব ও তাঁর চ্যানেলকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তারা ১৯২২ সালের একটি ইংরেজদের করা ঔপনিবেশিক আইনের সেকশন-৩ (১) খুঁজে বের করে একটা মিথ্যা কেস সাজিয়ে অর্ণবকে নতুন একটা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। সহকর্মীদের কাছ থেকে বিভিন্ন খবরের সোর্স জানার চেষ্টা করে যখন পুলিশ ব্যর্থ হয়, তখন একটি পুরনো কেস সেটা কোর্টের নির্দেশে বন্ধ হয়ে

গিয়েছিল বহুদিন আগে প্রমাণের অভাবে, সেটাকে কোর্টের অনুমতি না নিয়েই মুম্বই পুলিশ রি-ওপেন করে, সেটা আইনত করা যায় না। ওই কেসে অর্ণবের কোনও ভূমিকাই ছিল না, তা সত্ত্বেও তাঁকে জব্দ করার জন্য ওই কেসে তাঁর নাম জড়িয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কথায় বলে,। 'খলের কখনও ছলের অভাব হয় না।'

এরপর যেটা হয় ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে, স্বাধীন ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক ঘটনা। ৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখ সকালে হঠাৎ অর্ণবের ফ্ল্যাটে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী হাজির হয় বিনা খবরে। ধাক্কা মেরে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে তারা হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ে, অর্ণবকে হ্যাঁচকা টান মেরে তুলে বেল্ট ধরে, কেউ বা চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যায়, কোনও Arrest warrant তাদের কাছে ছিল না। অর্ণব তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারলেন না, তাঁকে জুতো পর্যন্ত পরতে দেওয়া হয়নি, অসভ্যতার চূড়ান্ত নজির সেদিন মুম্বাই পুলিশ রেখেছিল যা টেলিভিশন মারফত সারা দুনিয়া দেখল। আরও আছে। অর্ণবের ফ্ল্যাটের আশে পাশে, নীচে শ'খানেক কম্যান্ডো 'এ.কে-৪৭' উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল, দেখে মনে হচ্ছিল কোনও গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশবাহিনী কম্যান্ডো সমেত বিন লাদেন টাইপের কোনও লুকিয়ে থাকা টেররিস্টকে ধরতে এসেছে। তাঁকে ধাক্কা মারতে মারতে পুলিশভ্যানে তোলা হয়। পুলিশ তাঁর স্ত্রী-পুত্রকেও হেনস্থা করতে ছাড়েনি, তাঁদের নামে এফআইআর করে দেয়, যে পুলিশ সুশান্ত সিহ রাজপুতের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় একটিও এফআইআর করেনি আজ পর্যন্ত।

অর্ণবকে পাঠানো হয় কুখ্যাত তালোজা জেলে যেখানে শুধু ভয়ানক সন্ত্রাসবাদীদের রাখা হয়। এর কিছুদিন আগেই ওই জেলের সুপার পুলিশকে জানিয়েছিল যে আর কোনও অপরাধীকে যেন পাঠানো না হয় কারণ স্থানাভাব। তা সত্ত্বেও ওই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে অর্ণবকে পুলিশের খাঁচায় পুরে ওই জেলেই পাঠানো হয়। তাঁর উপর অত্যাচার চালানো হয় তাঁকেদিয়ে কিছু বলিয়ে নেবার জন্য, কিন্তু জাতীয়তাবাদী, নির্ভীক অর্ণব অসত্যের কাছে, অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াতে শেখেননি।

বম্বে হাইকোর্ট নানা অছিলায় তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে, তিনি এরপর সুপ্রিমকোর্টে আবেদন জানান। ইতিমধ্যে আমরা টিভি মারফত দেখলাম সারা ভারত তাঁর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে যাগযজ্ঞ হচ্ছে, সাধুসন্তরা পথে নেমেছেন, সাধারণ মানুষ ব্যানার, পোস্টার নিয়ে মিছিলে বেরিয়েছেন, বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, আমেরিকায়, ইংল্যান্ডে, ইউরোপে, অস্ট্রেলিয়ায়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যেখানে যত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয় আছেন, সকলে অর্ণবের মুক্তির দাবিতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন তাঁর বন্দিদশার প্রত্যেকটি দিন।

শেষ পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় তাঁকে মুক্তি দেয়। জাস্টিস চন্দ্রচূড় ও জাস্টিস ইন্দিরা ব্যানার্জি বম্বে হাইকোর্টের তিরস্কার করেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথাও তাঁরা বলেন যে সকল আদালতের এটা খেয়াল রাখা কর্তব্য যে বেছে বেছে কোনও বিশেষ নাগরিককে শুধুমাত্র হেনস্থ করার জন্য ক্রিমিনাল আইনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখটা ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সেদিন মুম্বইয়ের তালেজা জেলের সামনে জনসমুদ্র দেখা গেল। অগুনতি নারী-পুরুষ মালা নিয়ে ফুল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় অপেক্ষমান, অনেকে কেক, মিষ্টি নিয়ে এসেছে, অর্ণবের ছবিতে মুখে কেক, মিষ্টি ঠেকাচ্ছে, অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছিল হাতে হাতে। সন্ধ্যা নেমে এল, মোমবাতি জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে গেল, তখন জ্বলে উঠল হাজার হাজার মোবাইলের ফ্ল্যাশ। সবাই হাত তুলে আলো দেখাচ্ছে তাদের প্রিয় মানুষটিকে অভিবাদন জানাবে বলে। সারা দেশ আনন্দে উদ্বেল, সেই সঙ্গে প্রবাসী ভারতীয়রা আমেরিকায় ভারতীয়রা সারারাত জেগে বসেছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচার শোনার জন্য।

অবশেষে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ অর্ণবকে নিয়ে তাঁর গাড়ি বেরিয়ে এল। সম্ভবত তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন নিয়ে যেতে। কয়েক হাজার পুলিশ রাস্তায় হাজির ছিল ভিড় সামালাবার জন্য অপেক্ষমান জনতাকে তাঁর ত্রিসীমানায় যেতে দিল না পুলিশ, জনতা দূর থেকেই তাঁর দিকে মালা, ফুল ছুঁড়তে লাগল, ক্যামেরাম্যানদের হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল, অর্ণব জনগণের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে অর্ণব যখন গাড়ির হুড সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, জনগণের সে কী উল্লাস, যাক মানুষটা সুস্থ আছে, অনেকেরই মনে আশঙ্কা ছিল, না জানি তিনি কেমন আছেন, এ কথা ভেবে। অর্ণব সুপ্রিমকোর্টের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন, দিকে দিকে তাঁর নামে শুধু জয়ধ্বনি। তিনি হলিউডের কোনও হিরো নন, কোনও রাজনেতাও নন, মাইকেল জ্যাকসনের মতো কোনও পপ্ সিঙ্গারও নন, মেসি বা রোনাল্ডোর মতো জনপ্রিয় খেলোয়াড়ও নন, নিছক একজন সাংবাদিক। সেদিন দুনিয়া দেখল একজন সাংবাদিকের জনপ্রিয়তা কোন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে।

ভারতমাতার অমর সন্তান নেতাজী সুভাষের সংগ্রাম ছিল ভারতের স্বাধীনতার জন্য, আজকের সংগ্রাম সাংবাদিকের বাক স্বাধীনতার জন্য, নেতজীর সংগ্রাম ছিল আপোশহীন, অর্ণবেরও তাই, নেতাজী স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যে, অর্ণবের ফৌজ তাঁর রি পাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের সহকর্মীবৃন্দ। উভয়েরই নিখাদ দেশপ্রেম, দুর্জয় সাহস ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতা, যূথবদ্ধ বিরোধিতার সামনে মাথা নত না করে এগিয়ে যাওয়া, সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের হৃদয় জয় করেছে।

অর্ণব অপেক্ষমান জনগণের উদ্দেশ্যে যখন বললেন— 'ভারতমাতা কী জয়, 'বন্দে মাতরম্' তাঁরা এই দুটি দেশাত্মবোধক অমর বাণীর পুনরাবৃত্তি করলেন, দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে উঠল 'বন্দে মাতরম্' 'ভারতমাতা কী জয়।' □

ক্ষমতায় থাকার জন্যই কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের তুষ্টিকরণের রাজনীতি

ধীরেন দেবনাথ

অসমের মন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা সম্প্রতি এক জনসভায় কংগ্রেসকে 'মোল্লার দল' বলে অভিহিত করেছেন। তবে তিনি যা বলেছেন তা মিথ্যে তো নয়ই, বরং সর্বৈব সত্য। কারণ স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং দীর্ঘদিন দেশ শাসনে কংগ্রেসের ভূমিকা শুধু নৈরাশ্যজনকই নয়, কলঙ্কজনকও বটে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে গান্ধী- নেহরু কংগ্রেসকে ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, অহিংস ও আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে। কিন্তু কংগ্রেসেরই অপর একটি অংশ চেয়েছিল, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করতে। ফলে সৃষ্টি হয় নরমপন্থী ও চরমপন্থী নামে দুটি গোষ্ঠী। নরমপন্থীরা ছিলেন অহিংসায় বিশ্বাসী। আর চরমপন্থীরা ছিলেন এর বিরুদ্ধে। এঁদের মতে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের কাছে 'ন্যায়-বিচার' চাওয়া অরণ্যে রোদনেরই নামান্তর। তাই আনুগত্য ও আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিকে তাঁরা 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি' বলে নিন্দা করতেন। এঁদের প্রশ্ন, স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া 'ভিক্ষাবৃত্তি'র মাধ্যমে বিশ্বের কোনো দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে— এমন কোনো দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে কি? সত্যি বলতে, এই প্রশ্নকে কিন্তু অবান্তর বলা যাবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজদের বহু উপনিবেশ হাতছাড়া হয়েছে। এর কারণ বহু ইংরেজ সেনার মৃত্যু ও আর্থিক মন্দা। বহু ঐতিহাসিকের অভিমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে বিধ্বস্ত ব্রিটেন ১৯৪৬ সালে ভারতে ক্যাবিনেট মিশন পাঠিয়ে ভারতকে স্বাধীনতা দানে সম্মত হয়। কিন্তু মিশনের প্রতিনিধিরা জিন্নার দাবি মতো ভারতভাগ বা পাকিস্তান দাবিকে অগ্রাহ্য করেন। জিন্না পুনরায় দাবি তুলে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাক দেন। ফলে মুসলিম লিগের নেতৃত্বে এবং বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী তথা লিগ নেতা সুরাবর্দির প্রত্যক্ষ মদতে কলকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও পঞ্জাবে লিগ গুন্ডাদের হাতে হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ নিহত হয়। কারণ দাঙ্গা দমনে লিগ ও ইংরেজ সরকার কোনো উদ্যোগই নেয়নি। বরং তাদের সেই নিষ্ক্রিয়তায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হতাশ হয়ে পড়েন। নেহরু ও সর্দার প্যাটেল-সহ কংগ্রেস নেতারা লিগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান। কংগ্রেস মুসলমান তোষণের ফল হাতে হাতে পায়।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগের পর ইসলামিক পাকিস্তান থেকে হিন্দু ও শিখেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বন্যার স্রোতের ন্যায় আসতে থাকে গণতান্ত্রিক ভারতে। পক্ষান্তরে, সেকুলারবাদী নেহরুর আবেদনে অধিকাংশ মুসলমান ভারতে থেকে যায়। আর তাদের সুরক্ষা ও অধিকারের স্বার্থে ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হয় 'মুসলিম পার্সোনাল ল'। ফলে তারা পায় ভিন্ন বিচার ব্যবস্থা, যথেচ্ছ সন্তান উৎপাদনের অনুমতি, একাধিক বিয়ে ও তালাক, ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণের স্বার্থে মাদ্রাসা ও মক্তব গঠন, ইসলামের প্রচার, ধর্মান্তরকরণ, গোহত্যা, মসজিদ নির্মাণ, চাকরিতে সংরক্ষণের সুযোগ ও সুবিধা। অর্থাৎ একদেশে দুই আইন। উদ্দেশ্য মুসলমানদের ভোটব্যাঙ্ক করে রাখা, ক্ষমতা দখলে রাখার স্বার্থে। আর এরই সুবাদে সৃষ্টি হয় মুসলমান তোষণের নীতি, যা ভারতীয় সমাজ ও সার্বভৌমত্বকে টেনে নিয়ে যায় সর্বনাশের দিকে।

ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছে 'মিনি পাকিস্তান'। পশ্চিমবঙ্গ তাদের মধ্যে অন্যতম। এরাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ। প্রতিনিয়ত এ রাজ্যে ঢুকছে উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা। ঢুকছে ইসলামিক জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদী ও চোরাকারবারিরা। আর এভাবে চলতে থাকলে, এরাজ্য অচিরেই দ্বিতীয় কাশ্মীর হবে। কংগ্রেসের গর্ভজাত তৃণমূল কংগ্রেস, মুসলমান তোষণকারী কমিউনিস্ট দলগুলি, কংগ্রেস ও ইসলামিক সংগঠনগুলি এ কাজে অতিশয় তৎপর। তাছাড়া বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী কংগ্রেসের ন্যায় মুসলিম লিগের দালাল কমিউনিস্টরাও পাকিস্তানের দাবিকে ন্যায্য, প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী দাবি বলে স্বীকার করেছেন। সত্যি বলতে, কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' (People's War) পত্রিকাটি ছিল বকলমে মুসলিম লিগেরই মুখপত্র।

ওদিকে কাশ্মীর নিয়ে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাকেও হার মানায়। ১৯৪৭-এর১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ ভেঙে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল ৫২৯টি স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ৫২৮ টিকে ভারতভুক্ত করেন। কিন্তু নেহরু কাশ্মীরের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখেন। সমস্যার সূত্রপাত তখন থেকেই। তিনি জানতেন, জিন্নার শ্যেনদৃষ্টি রয়েছে কাশ্মীরের ওপর। তবুও তিনি গোয়েন্দা বিভাগকে নিষ্ক্রিয় করে এবং তাদের রিপোর্টকে চেপে রাখেন। ২৫ আগস্ট পাকিস্তানের পত্রিকা মহারাজ হরি সিংহকে হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখে, কাশ্মীর পাকিস্তানে যোগ না দিলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। কিন্তু ভারত সরকার তার কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি। জল, স্থল ও বিমানশক্তিতে পাকিস্তানের চেয়ে ভারত বহুগুণ শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ চলে এক বছরাধিক। এর পরেও কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ রয়ে যায় পাক অধিকারে। তাই প্রশ্ন জাগে, কাশ্মীর যুদ্ধে এহেন ব্যর্থতার কারণ কী? সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা, না নেহরু সরকারের যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্য উদ্দেশ্য ছিল? কাশ্মীরে পাক আক্রমণের পরিকল্পনা গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারেনি। পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণের খবর ভারত সরকার জানতে পারে ২ দিন পরে। তাও আবার পাক সেনাপ্রধানের মাধ্যমে। আক্রান্ত কাশ্মীরের মহারাজ হরি সিংহ ভারতের কাছে সাহায্যের জন্য জরুরি আবেদন জানালেও ভারত সরকার তা অগ্রাহ্য করে। কারণ কাশ্মীর ভারতের অংশ নয়, তাই সেখানে আইনত সৈন্য পাঠাতে পারে না সরকার, এই অজুহাতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঁচদিন পর ভারত সরকার লে: কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ

রাইয়ের নেতৃত্বে সাধারণ অস্ত্র-সহ ৩২৯ জন সৈন্যকে কাশ্মীরে পাঠায়। যেখানে পাকিস্তানের বিশাল হানাদার বাহিনী ছিল আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত। আসলে নেহরু চাইছিল কাশ্মীরের পাকিস্তানভুক্তি। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরকে জিগরি-দোস্ত জিন্নার হাতে তুলে দিয়ে খুশি করতে। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! পাশা যায় উলটে। ভারতীয় সেনাদের মারে পাক সেনাদের যখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, জয় প্রায় দোরগোড়ায়, তখন কাশ্মীর সমস্যাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে যান নেহরু। যদিও নেহরু ইচ্ছে করলে সামরিক বাহিনী নামিয়ে কাশ্মীর হানাদারমুক্ত করতে পারতেন। দখল করতে পারতেন বিরাট পাক ভূখণ্ড। কিন্তু কালক্ষেপের উদ্দেশ্যে তিনি শান্তি বৈঠক করতেন পাক রাজধানীতে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে নয়।

উচ্চাভিলাষী, জিন্নাপ্রেমী, ক্ষমতালোভী ও ধূর্ত নেহরু জিন্নাকে খুশি করতে মেনে নেন তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্ব। সম্মত হন ভারত ভাগে। জিন্নার দাবি ছিল বাঙ্গলা, পঞ্জাব ও কাশ্মীর। তবে বাঙ্গলা ও পঞ্জাবের অর্ধাংশ জিন্না পেয়ে গেলেও তখনও পাননি কাশ্মীর। তাই জিন্নার সঙ্গে তাঁর বৈঠক, সেনাবাহিনীকে ভুল পথে চালানো, ভারতীয় সেনারা যখন কাশ্মীরের বাকি অর্ধাংশ দখল করতে যাচ্ছে তখনই এককভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে গণভোটের দাবিতে নেহরুর রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা ইত্যাদি সেই ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশের প্রতি চরম বেইমানি আর কাকে বলে? আরও লক্ষণীয়, ৬৫ ও ৭১-এর পাক-ভারতযুদ্ধে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে সেনাবাহিনী পাকিস্তানের এক বিরাট অংশ দখল করলেও পুনরুদ্ধার করেনি পাক অধিকৃত কাশ্মীর। সত্যি বলতে কী, দেশভাগে নেহরু ছিলেন জিন্নার সহযোগী। তাই সমাজবাদী নেতা ড. রামমনোহর লোহিয়া নেহরু সম্পর্কে বলেছেন— 'ভারত ভাগের দোষী ব্যক্তি' (Guilty man of India's Partition)।

এখানেই শেষ নয়। নেহরুর পাক ও জিন্নাপ্রীতি এবং ভারত ও ভারতবাসী হিন্দুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার রয়েছে আরও নজির। ১৯৪৯ সাল। ড. আম্বেদকর ছিলেন ভারতের আইনমন্ত্রী ও সংবিধান খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান। নেহরুর আর এক জিগরি দোস্ত শেখ আবদুল্লা তাঁর সঙ্গে দেখা করে কাশ্মীরের জন্য বিশেষ মর্যাদার দাবি করেন। ড. আম্বেদকর তখন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'আপনি চান না, ভারত কাশ্মীরকে রক্ষা করুক ও ভারতের সর্বত্র কাশ্মীরিরা সমানাধিকার পাক। আপনি চান না কাশ্মীরি ও ভারতীয়দের সমানাধিকার। আমি ভারতের আইনমন্ত্রী। আমি জাতির স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। (The Statesman : 5.4.94)। ভারতের আইনমন্ত্রী ভারতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেননি, অথচ প্রধানমন্ত্রী নেহরু সে কাজটি করতে দ্বিধা করেননি। আসলে নেহরুর রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস।

চীন-রাশিয়ার দালাল, বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী কমিউনিস্টরা যে হিন্দু বিদ্বেষী ও মোল্লাপন্থী তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু গান্ধীপন্থী কংগ্রেসিরা যে তার থেকেও এক ডিগ্রি উপরে তা অনেকেরই অজানা। তাই গান্ধী-নেহেরুর অবিমৃশ্যকারিতার জন্যই যে দেশভাগ এবং ক্ষমতায় থাকার জন্যই মুসলমান তোষণ, সে ইতিহাসও আজ সর্বৈব সত্য।

ভারতীয় সংবিধানের ২১নং ধারায় ৩৭০ ধারা অন্তর্ভুক্ত হলে তাকে বলা হয়েছিল— অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল ও বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু ভবিষ্যতে সেটাই স্থায়ী হয়ে যায়। আর এটাও নেহরুর অবদান। বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী ও হিন্দুবিদ্বেষী কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও সেকুলারিস্টদের কাছে এটি হয় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। তাই অস্থায়ী এই ধারা বাতিলের দাবি সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দিত হয়। ভারত বিরোধী তথা হিন্দু বিদ্বেষী শেখ আবদুল্লা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই ১৯৫১ সালে কাশ্মীরের জন্য রচনা করেন এক পৃথক সংবিধান, যাতে মুখ্যমন্ত্রীর নাম হয় প্রধানমন্ত্রী বা উজির-এ-আজম, রাজ্যপালের নাম হয় সদর-ই-রিয়াসত। তৈরি হয় আলাদা জাতীয় পতাকা। সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাচন কমিশনের আওতা থেকে মুক্ত করা হয় কাশ্মীরকে। কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য চালু করা হয় 'পারমিট' প্রথা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ভারতকেশরী ও হিন্দুস্বার্থরক্ষাকারী ভারতপ্রেমী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তিনি দাবি করেন— এক দেশে দুই বিধান, দুই প্রধান ও দুই নিশান চলবে না। তিনি পারমিট প্রথা ও ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবিতে ১৯৫৩-র ১০ মে দলের সাধারণ সম্পাদক অটলবিহারী সহ অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে কাশ্মীর অভিযান করেন। অনেকের বিশ্বাস— বিশ্বাসঘাতক ও কুচক্রী নেহরু ও শেখ আবদুল্লার চক্রান্তে কাশ্মীর পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ৩৭০ ধারাকে হাতিয়ার করে কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য করার এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। তার ফলস্বরূপ, ইসলামিক রীতি মেনে ১৯৯০ সালে মুসলমানরা ধর্ষণ, হত্যা ও বীভৎস সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কাশ্মীর থেকে তিন লক্ষাধিক কাশ্মীরি পণ্ডিতকে বিতাড়িত করে। আজ কাশ্মীর প্রায় হিন্দু শূন্য। বহু মঠ-মন্দির হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত নয়তো মসজিদে পরিণত হয়েছে। অসংখ্য হিন্দুকে বাধ্য করা হয়েছে ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে। তাছাড়া অমরনাথ জমি বিতর্কও ছিল ওই একই কারণে। অর্থাৎ ইসলামিক কাশ্মীরে হিন্দু, মঠ-মন্দির ও ধর্মস্থান থাকার কোনো অধিকার ছিল না। উলটে সেখানে সৃষ্টি করা হয়েছে হিন্দু ও ভারত বিরোধী নানা ইসলামিক জঙ্গি, রাজাকার ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যাদের অস্ত্র ট্রেনিং, অর্থ ও মদত জুগিয়ে আসছিল পাকিস্তান-সহ কিছু মুসলমান দেশ। তাদের টার্গেট ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী। ৪৭ সালের আগে মুসলমানদের দাবি ছিল পাকিস্তান। আজ তাদের দাবি 'আজাদি'— পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও সেকুলারিস্টরা যেমন মুসলমান তোষণ করে ভারত বিভাজনকে ত্বরান্বিত করেছে, আজও সেই অশুভ চক্র দেশ ও জাতির স্বার্থে কুঠারাঘাত করে 'আজাদি'র দাবিকে করছে শক্তিশালী। তাই কাশ্মীরে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন হতো না, হতো ১৪ আগস্ট পাক স্বাধীনতা দিবসে। স্লোগান উঠত 'হম পাকিস্তানি'। পদদলিত করা হতো

ত্রিবর্ণ ভারতীয় পতাকা। অগ্নিদগ্ধ করা হয় হাজার হাজার তিরঙ্গা। পাক পতাকা হাতে নিয়ে মুসলমানরা তুলতো 'পাকিস্তান— জিন্দাবাদ' ধ্বনি। তবে খুশির ব্যাপার একটাই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সংসদে ধ্বনি ভোটে ৩৭০ ধারার বিলোপ ঘটিয়ে স্বাধীনতার ৭২ বছর পরে কাশ্মীর ও লাদাখকে ভারতভুক্ত করেছে। কাশ্মীর এখন ভারতের। তবে এ ঘটনায় কংগ্রেস-সহ মুসলমান তোষণকারীরা দুঃখ পেয়েছে। কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ নেহরু জমানার পরেও বজায় ছিল। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন করে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র' শব্দ দুটি যোগ করেন। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা চালু হওয়ায় খিস্টান ও মুসলমানরা খুশি হয়। কারণ তার ফলে হিন্দু শিখদের ধর্মান্তর করা সহজ হয়। তাছাড়া 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' বজায় রেখে মুসলমানদের একাধিক বিয়ে, তালাক, অবৈজ্ঞানিক মাদ্রাসা শিক্ষা, গোহত্যা ইত্যাদির সুযোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়, যা ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমতার পরিপন্থী। তবে কংগ্রেস শাসনে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা সর্বাধিক অন্যায়, অবিচার ও দমন-পীড়নের শিকার হয়েছে। পক্ষান্তরে, মুসলমানরা হয়েছে খুশি, উপকৃত। একথা কমিউনিস্ট, সেকুলারিস্টদের শাসনকালের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য।

অসমে দীর্ঘকাল শাসন করেছে কংগ্রেস। স্বাধীনতার পর ওই রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন গোপীনাথ বরদলৈ। তিনি ছিলেন কংগ্রেসি। তাঁর একটি কথা, 'অসম অসমীয়দের' তখন অসমীয় ও বাঙ্গালিদের মধ্যে সৃষ্টি করে এক বৈষম্য। সেই থেকে শুরু অসমিয়াদের বাঙ্গালি বিদ্বেষ। অতঃপর আসু 'বঙ্গাল খেদাও' ডাক দেয়। অসমের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা ঘটে। 'আসু'র ছাত্র নেতা প্রফুল্ল মহন্ত ও ভৃগু ফুকন অসম গণপরিষদ (অগপ) গঠন করে নির্বাচনে লড়ে সাফল্য পান। কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরতে মুসলমান তোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কারণ অসমে মুসলমানদের সংখ্যাটি বেশ বড়ো। তাছাড়া অসমে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন একাধিকবার। সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক আসরে নামেন ধনী আতর ব্যবসায়ী বদরুদ্দিন আজমল। তাঁর দলে যোগ দেন বহু মুসলমান। কংগ্রেসিরাও। ইতিমধ্যে বিজেপি অসমে শক্তি বৃদ্ধি করে ক্ষমতায় আসে। অসমে এ বছরই ভোট। এবারও বিজেপি ফেভারিট। তাই ক্ষমতা হারা ছন্নছাড়া কংগ্রেস ক্ষমতা দখলে বদরুদ্দিনের হাতও ধরতে পারে বলে মন্ত্রী হিমন্তর বিশ্বশর্মা মনে করেন। তাই তিনি কংগ্রেসকে বলেছেন 'মোল্লার দল'। এখন দেখা যাক, মোল্লার দৌড় কত দূর?নেহরু শুধু দেশমাতৃকার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, করেছে কংগ্রেসের সঙ্গেও। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরী অধিবেশনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পুনরায় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন গান্ধীজীর সমর্থিত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে। এ ঘটনায় গান্ধীজী অপমানিত বোধ করে মন্তব্য করেন— 'সীতারামাইয়ার পরাজয় আমার পরাজয়।' গান্ধীজীর ওই মন্তব্যে অপমানিত বোধ করে নেতাজী কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। আবার কমিউনিস্টদের বন্ধু নেহরু বলেছিলেন— সুভাষ ভারতে ঢুকলে তিনি খোলা তরোয়াল হাতে সুভাষকে অভ্যর্থনা জানাবেন। পরিশেষে একথাই বলতে হয়, চীন-রাশিয়ার দালাল, বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী কমিউনিস্টরা যে হিন্দু বিদ্বেষী ও মোল্লাপন্থী তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু গান্ধীপন্থী কংগ্রেসিরা যে তার থেকেও এক ডিগ্রি উপরে তা অনেকেরই অজানা। তাই গান্ধী-নেহেরুর অবিমৃশ্যকারিতার জন্যই যে দেশভাগ এবং ক্ষমতায় থাকার জন্যই মুসলমান তোষণ, সে ইতিহাসও আজ সর্বৈব সত্য। □

WITH BEST WISHES

TEWARI BROTHERS

PURE DESHI GHEE PRODUCTS

3A, JAGMOHAN MULLICK LANE (BURRA BAZAR)
KOLKATA – 700 007

PHONES: 2268 – 3020/8913
6291225670 / 8981026906
SWEETS (COTTON STREET): 2268 - 9392
8981026911
MITHAI SHOP (NEW ALIPORE): 2498 - 1155/1133
8981026905 - 03340054150
CONFECTIONERS (MINTO PARK) – 2287 – 5613

CONFECTIONERS (KAKURGACHI) – 2355 - 8374